০ ১ ২´ ৩
। সা গা -া । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মি ল ন্ ম ধু র০ হা ০ ০ সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। { গা গা পা । পা পা পা I না ধা না । পা -ক্ষা গা ।
শু নি ব বি র হ নী র ব ক ন্ ঠে

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
মি ল ন মু খ র০ বা ০ ০ ণী ০ ০

ধুয়া :—

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা -পা । র্সা র্সা র্সা I পা -ধা -না । ধা -পা -া ।
আ মা র্ কু টী র রা ০ ০ ণী ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা রা গা । ক্ষা পা -া I না না না ধা । পক্ষা গা -া } IIII
সে যে গো আ মা র্ হৃ দ য় রা০ ণী ০

দ্রষ্টব্য।—যে যে জায়গায় 'ধুয়া'—বলে লেখা আছে, সে সে স্থানে উল্লিখিত সুরে ও তালে 'ধুয়া' গেয়। বলা বাহুল্য যে এ গানখানি বহুল প্রচলিত গান; তাই মত্ বিশেষে গানটি একটু পরিবর্ত্তিত সুরেও গীত হ'য়ে থাকে, এবং পংক্তি বিশেষ বাদ্‌ও দেওয়া হয়। যাই হ'ক্। এখানে কিন্তু অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গাওয়া হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হ'ল।——লেখিকা।

শোক সংবাদ—চট্টলের প্রিয়কবি বঙ্গকাব্যকুঞ্জের একজন কলকণ্ঠপিক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রতিভা-রবি মধ্যগগনে উপনীত হইয়াই অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। জীবেন্দ্রকুমার আমাদের নারায়ণের একজন নিয়মিত লেখক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহার অভাব নারায়ণের বুকে বড়ই বাজিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার স্বর্গগত আত্মা শান্তিলাভ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ভ্রম সংশোধন—গতবারের পঞ্চপ্রদীপে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বীরভাবের কথা'র নিম্নে ভ্রমক্রমে প্রবর্ত্তকের নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

দ্রষ্টব্য—নারায়ণের ষাণ্মাসিক সূচী জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইবে

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] শ্রাবণ, ১৩২৯

দেশের অবস্থা

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পুর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ-জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিগে প্রচার করে বলেছিলাম স্বরাজ চাইই চাই। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোনদিন প্রতিবিধান করতে পারব না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবর্ষীদের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত রাখে, সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না কোরে পথ নাই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারে না, এতো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্ব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতায় যদি আমাদের জন্ম-স্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায়ী হয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ

হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব :এত বড় অন্যায়-অসঙ্গত দাবী, এতবড় পাগলামী আরত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতা আমাদের :চাই, এ কথাও কোনমতেই সত্য হতে পারে না! এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন, স্বয়ং বিধাতা পুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না! এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চির-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখনো পায়নি, পায়না এবং আমার বিশ্বাস কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারে না। কর্ত্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। অথচ, এই যদি আমাদের ঈপ্সিত বস্তু হয়, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারা যদি আমরা সত্যই গ্রহণ করে থাকি, তা'হলে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না। কাজ কোরব না, মূল্য দেব না, অথচ জিনিষ পাওয়া চাই, এ হলে হয়ত সুবিধে হয়, কিন্তু সংসারে তা' হয় না, এবং আমার বিশ্বাস, হলে মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বাড়ে। অথচ মূল্যহীন এ ভিক্ষায় চাওয়াকেই আমরা সার করেছি। বছর দেড়েক ঘুরে ঘুরে নিজের চোখেই আমাকে অনেক দেখ্‌তে হয়েছে এবং একটুখানি অবিনয়ের অপবাদ নিয়েও বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা' যা' দেখেছি (অন্ততঃ এই হাবড়া জেলায় যা' দেখেছি) তা' নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের :কাজকর্ম্ম, লোকলৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধের কোথাও যেন কোন ত্রুটী না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চুণ পর্য্যন্ত যেন না খস্‌তে পায়,—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, যায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা' হয় তা' হোক, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু ইংরাজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, সে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার

শিকল মজবুত করে তৈরী করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গলায় এবং কলমে গালি-গালাজ করে, তার ত্রুটী ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু :পাওয়া যাবে,—এ প্রশ্ন ত সকল দ্বন্দ্বের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই লজ্জাকর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘট্‌বে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্ব কথা শোনবার ধৈর্য্যও আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, ত সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ-শিখার, দীপের নয়; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী দাওয়া উত্থাপনের আগে এ কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবী শুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথম দিনে মারামারি কাটা-কাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্ব্বে বল্‌লে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল, Anglo Indian কাগজওয়ালারা হেঁসে জবাব দিলে এ শুধু নিছক্ indifference! আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয় যদি হয়ে ও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্ব্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence? সে তো কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্রব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছা ও নয়, অথচ একথাও ত কেউ জোর করে বল্‌তে পারিনে আমাদের বাড়ী ফেরবার পথটুকুর মাঝেই হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে দিতে না পারি। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই এবং আমিও একে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা; আর Indifference? এ কথায় যদি :তারা ইঙ্গিত করে থাকে যে, দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি ত, তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না।

ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা' অবশ্যম্ভাবী, তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া পড়া, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি তামাসা, কাজকর্ম্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চল্‌তে থাকে, মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের উপর। কেউ বল্‌লে তার প্রশংসা বাক্য শুধু ভণ্ডামি, কেউ বল্‌লে তার ছ'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বল্‌লে বড় জোর তিন বছর, কেউ বল্‌লে, না চার বছর; কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হল' তখন আর উপায় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল হোক না জেল ছ'বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা ত তাঁর দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন-বেশী কেউ তাঁকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা' সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হোন্। কিন্তু যে আশা তার একার ছিল, সমস্ত দেশের লোকের সে ভরসা কর্‌বার সাহস হোলো না। তাদের অর্থোপার্জ্জন থেকে সুরু করে আহার নিদ্রা অব্যাহত চল্‌তে লাগ্‌ল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হোলোনা, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্ম্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচ্‌তে লাগলেন। প্রতিবিধান কর্‌বে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জাবোধ কর্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজির movement কি practical? তাইত আমরা—কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে, কোন movement কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে Co-operation, Non-co-operation (violence, non-violence) এর যে কোন একটাই স্বাধীনতা দিতে পারে; শুধু যে ভীরু, যে দুর্ব্বল, যে মৃত, তার কাছে ভিক্ষে ছাড়া আর কোন পথই উন্মুক্ত নেই। সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয়, Non-co-opration পন্থা দেশে অচল,—মুক্তির পথ সে দিকে যায়নি। অন্ততঃ এমনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক্, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে, এরা কারা

জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকীল তার ওকালতী ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এঁরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাঁদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তাঁরা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, ভিক্ষুকের দল। দেশের চোখে আজ তাঁরা হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়ার দল। তাদের মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাপন করে যৎসামান্য তেল-নুণের পয়সার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয় অথচ স্বেচ্ছায় যে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে, কতটুকুতে তার প্রয়োজন,সে প্রয়োজন সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎকর। এইটুকু সে সম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না, মাত্র এইটুকুর জন্য তাঁর অসুবিধের অন্ত নাই; অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্য্যাতনের কাহিনী সংবাদ পত্রে পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—,যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা এদের দেশের লোকের কাছেই সহ্য করতে হয়? মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক, এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীনহীন ব্যর্থ করে তোলবার, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত, দেশের লোককে এক দিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও সত্যকার বিধি বিধান কোথাও কোন খানে থাকে।

হাবড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলার লোকে স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য, কেউ কিছু কোরব না, কোন সুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধাধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় একতিল বাহিরে যেতে পারব না,—আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর উপর গাড়ী, আমার দোতালার উপর তেতালা এবং তার উপর চৌতালা অবারিত এবং অব্যাহত উঠ্‌তে থাক—কেবল এই গোটা কতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু

এমন কাণ্ড কোথাও হয় না। আসল কথা এরা বিশ্বাস কর্‌তেই পারে না, স্বরাজ না কি আবার কখনও হতে পারে। তার জন্য আবার না কি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাঁতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চ্চায়! নিভানো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে আর কিছুতে! একটা নমুনা দিই—

সেদিন নারীকর্ম্মমন্দির থেকে জন দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মশায়কে নিয়ে দুর্য্যোগের মধ্যেই আম্‌তা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ঋষিতুল্য সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটাকে সঙ্গে নেওয়ায় এ যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল; বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মনুষ্যটীকে স্থানীয় রায় বাহাদুরের ভাঙ্গা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হল টাকা পঞ্চাশ, ঝড়ে, জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এম্‌নি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকীল মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতির কল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হল তিন টাকা পাঁচ আনা। আর রায় মহাশয় বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কার কর্‌লেন জন দুই উকীল বিলিতি কাপড় কেনেন না, এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কিন্‌বেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কাণে কাণে বল্‌লেন, হাঁ, জিলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, Civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare কর্‌তে পার্‌বেন!

আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।

এচিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি! কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন প্রতিষ্ঠা, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেচে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Government-এর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

আমার এক আশা, সংসারে সমস্ত শক্তিই তরঙ্গগতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান-পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নীচে পড়চে, কাল সেই আবার উপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখর-দেশ এক স্থানে উঁচু হইয়েই থাকে, তাকে নাম্‌তে হয় না। কিন্তু বায়ুতাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গের সে ব্যবস্থা নয়—তার উঠা পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। সে কেবল উঁচু হয়েই থাকৃতে চায়। যখন জমে, বরফ হয়ে উঠে। তেমনি আমাদের এও যদি একটা movement হয়, পরাধীন দেশে একটা অভিনব গতিবেগ হয়; তা' হলে উঠানামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চল্‌তেই পার্‌বেনা।

চির-শিশু

[কাজী নজরুল ইসলাম]

নাম-হারা তুই পথিক-শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পর্‌লি কাঁকন বাঁধন-হারার কোন্ কারাএ॥
আবার মনের নতন করে'
কোন্ নামে বল্ ডাকৃব তোরে?
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে॥
ওরে যাদু, ওরে মাণিক, আঁধার-ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী।
আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সাগর উথ্‌লে বুকে,
নূতন নামে ডাকৃতে তোকে
ওরে ওকে কণ্ঠ রুখে, উঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে?
অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয়-পানে পা বারায়ে॥

প্রলয়-বিষাণ

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

কোথায় ওরে প্রলয়-বিষাণ,
পিণাকপাণির হাতে আবার
তোলো ভাঙার গান ;
তোমার ঐ ভীম আরাবে বাজো তুমি বাজো,
কাঁপায়ে এই বিশ্ব-চক্র অসীম ব্যোমে রাজো ;
জমাট—বাঁধা বিপুলছন্দে করো খান খান
আধ-মরা এই ভারতবাসীর মরচে-পড়া প্রাণ।
সত্যকে যে হেলা করে' মিথ্যা বরে আজো
ঝঙ্কারে তার প্রাণের সেতার দুমড়ে দিয়ে বাজো,
সেই ভাঙা তারে ভীম ঝঙ্কারে
তুলি ধ্বংশ-তান
বাজো ওরে প্রলয় বিষাণ !

কোথায় ওরে প্রলয়—বিষাণ,
জাগাও তোমার অট্টহাসে
প্রাণ-কাঁপান তান ;
রণিয়ে উঠুক হ্রেষাধ্বনি দিগম্বর কোলে,
বজ্র-নাদে তুফান-তালে উল্কা যেন দোলে,
মরার আগে মরে যারা তাদের মেরে রাখো,
মহাকালের রথে চড়ে বিশ্ব জুড়ে থাকো ;
প্রলয় দিয়ে নূতন সৃষ্টি বরণ করে আনো,
ভাঙ্গাগড়ার খেলা এবার নূতন করে জানো ;
ধ্বংশনেমির ভীষণ রবে
কাঁপায়ে দূর বিমান
বাজো ওরে প্রলয়-বিষাণ !

লতা

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লতাকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন সে স্বামীর সহিত হুগলীতে আসিয়াছে পুত্রের অযত্ন হইবে বলিয়া জমীদার ও তাঁহার গৃহিণী বধূকে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার স্বামী হুগলীতে ওকালতি করিতেন। নির্ম্মলকান্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি বি, এ পাশ করিয়া বি, এল পড়েন ও নির্ম্মলকান্ত এম, এ পাশ করিয়া প্রফেসর হন। ইঁহাদের এই বন্ধুত্বের সূত্রে লতার সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের আশৈশব সকল কথা আমি কতক লতার নিজমুখে এবং কতক লতার মাতার মুখে শুনিয়াছিলাম।

প্রথম পরিচয়েই আমি লতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়,—তাহার সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি পবিত্র ভাব ছিল। তাহার মধ্যেও এমন একটা অটল গাম্ভীর্য্য ছিল, যে নিতান্ত লঘু প্রকৃতির মানুষও তাহার নিকট নত মস্তক হইত। অন্য দিকে তাহার প্রকৃতি শিশুর মত সরল ছিল। আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলিতেন,—"নির্ম্মলের স্ত্রী যেখান দিয়ে হেঁটে যায় সেখানটা যেন পবিত্র হয়ে যায়।" সত্যই তাহাকে দেখিলে ঐরূপ মনে হইত।

শিশুকাল হইতেই আমার দৃষ্টি সকল বিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। আমি ক্রমে লতার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাহার সমগ্র সদ্‌গুণের মধ্যে একটী গুণের অভাব দেখিয়া আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইতাম। সেটি কি ? সেটি মানুষের সকল প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্ব্বলতার প্রতি ক্ষমার অভাব। তাহার কোমল হৃদয় সেখানে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইত। সে সেখানে বিচার যুক্তি তর্ক কিছুই মানিত না। তাহার সহিত মাঝে মাঝে এই বিষয় লইয়া বাক্ বিতণ্ডা হইত। আমি বলিতাম—

"লতা ! ক্ষমা জিনিষটা বড় সুন্দর, সে জিনিষটা আমাদের প্রাণকে বড় সুন্দর বড় উচ্চ করে। মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা ক'রতে চেষ্টা করাই উচিত।"

লতা বলিত,—

"কেন দিদি, ভগবান সকলকেই বিবেক বলে একটা জিনিষ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যে বিপথে যাবে তাকে কেন ক্ষমা করব ?"

আমি বলিলাম,—

"লতা, মানুষ কি অবস্থায় কি অভাবে কোন পথে যায় তা আমরা কি করে জান্‌ব। মানুষের জীবনে কত প্রতিকূল অবস্থা আসে, কত প্রলোভন আসে, বন্ধুরূপে কত শত্রু আসে। অত্যন্ত সবলচিত্ত মানুষ না হ'লে সে সকল উপেক্ষা ক'রতে পারে না। ভেবে দেখ সে সময়ে যদি একজন মানুষকে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই ত্যাগ করে তবে কি সে ক্রমেই নরকের পথেই অগ্রসর হয় না! আমার মনে হয় সে সময়ে তাকে তার দুর্ব্বলতা থেকে অতি সহজে তুলে নেওয়া যায়।"

লতা বলিত,—

"তুমি যা বলছ তা বুঝ্‌তে পারি কিন্তু পাপকে যদি কেবল ক্ষমাই ক'রব তবে পাপের সংহার কোথায় ?"

আমি হাসিয়া বলিতাম,—

"লতা! আমি একথা বলছি না যে পাপের সংসর্গ মানুষ ত্যাগ ক'রবে না কিম্বা পাপকে ঘৃণা কর'বে না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার না ক'রে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। লতা! আমার বাবা অত্যন্ত নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন,—তাঁহার শিশুর মত সরলতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তাঁর যে উদারতা ছিল,—তা আর কারো মধ্যে বড় দেখতে পাই না। তিনি বলতেন,—"মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা ক'রে তাকে বুকে তুলে নিতে পারলে তাকে নরক থেকে উদ্ধার করা যায় কিন্তু তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে থাকলে সে আরও নীচে নেমে যায়। একথা কখনও ভুলো না রমা!" তাঁর সে সব অমূল্য উপদেশ কতটুকুই বা গ্রহণ কর'তে পেরেছি। তবু যে দু একটা কথা বলি সে তাঁরই সেই জ্ঞান সাগরের দু একটি বুদ্বুদ মাত্র।"

লতা আমার কথা বুঝিয়াও বুঝিত না। তার ঐ এক কথা ছিল,—"ওসব মুখের কথা দিদি! কাজে কি কেউ তা পারে? কাল যদি তুমি শোন তোমার স্বামী একটা অত্যন্ত নীচ কার্য্য করেছেন তুমি কি তাকে এক কথায়ই ক্ষমা ক'রতে পারবে? তাহলে আর আত্ম সম্মান বলে জিনিষ এ সংসারে কোথায় রইল দিদি ?"

লতার এইভাবে আমি বড় ব্যথিত হইতাম। এবং এই জন্য সে জীবনে বহুতর অশান্তি ভোগ করিবে এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। হায়! তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কি ভীষণভাবে সফল হইবে।

৫।—

দুই বৎসর পরের কথা। আমার মাতার প্রাণসংশয় পীড়ার কথা শুনিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। আমার ক্রোড়ে তখন ছয় মাসের একটি ক্ষুদ্র শিশু। মা আমার প্রায় আট মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বর্গারোহন করিলেন। ইহার মধ্যে আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই। হুগলী হইতে স্বামীর নিয়মিত পত্রে সকলের সংবাদ পাইতাম। লতাও মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। পত্রগুলির প্রতিপংক্তিতে তাহার পরিপূর্ণ সুখের আভাষ ফুটিয়া উঠিত। আমি পত্রগুলি পড়িয়া বড়ই সুখী হইতাম। সত্য কথা বলিতে কি লতাকে আমি ছোট ভগিনীর মতই ভাল বাসিতাম। আমার হুগলী ত্যাগের দুই মাস পর লতার পত্রে একটি শুভ সংবাদ পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম!

মা'র শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সুদীর্ঘ নয় মাস পরে গৃহে ফিরিলাম।

শুনিলাম লতাকে লইতে তাহার পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে। আগামী পরশ্ব ভাল দিন সে সেই দিনে রওনা হইবে। বৈকালে লতাকে দেখিতে গেলাম। লতার মুখে এবার নূতন সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার অবস্থানুযায়ী ম্লান ও পাণ্ডুর মুখে একটি নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মাতৃত্বের প্রথম নিদর্শন! আমাকে দেখিয়া লতা হাত ধরিয়া শয়ন গৃহে লইয়া গেল। আমার পাশে বসিয়া, আমার গলা ধরিয়া সে কিছুক্ষণ নীরব রহিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বাপের বাড়ী যাচ্ছিস নাকি ?"

মৃদু হাসিয়া লতা বলিল,—

"হ্যাঁ দিদি, মা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। উনি প্রথমে দিতে চাননি,—কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীও যেতে লিখেছেন। ওঁর একা একা বড় কষ্ট হবে। তোমাদের ওপর নির্ভর করেই যাচ্ছি, তোমরা খোঁজ খবর নিও। আমারও যেতে মন সর্‌ছে না দিদি"———বলিয়া লতা হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—

"তাকি আর জানি না ভাই ! তোরা আবার একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকবি। তুই গেলে নির্ম্মল বাবুকে কি ক'রে সামলাব জানি না। লোকটা পাগল হয়ে না গেলে বাঁচি।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতা বলিল,—

"যাও দিদি, তুমি বড় দুষ্টু !"

রাত্রে গৃহে ফিরিলাম। লতা যাওয়ার পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে দেখা দিবার জন্ত বার বার অনুরোধ করিল। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিল। আমি তাহার পরদিন আবার যাইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিলাম।

পর দিন সন্ধ্যার সময় অন্যান্ত গৃহ কার্য্য শেষ করিয়া শ্বশ্রুমাতার জলযোগের সমস্ত গুছাইলাম। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক হইলে তাঁহাকে জলযোগ করাইয়া লতার নিকট যাইব স্থির করিয়াছিলাম। তাহা হইলে একটু বেশীক্ষণ লতার নিকট বসিতে পারিব বলিয়াই ঐ বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এমন সময়ে লতাদের বেয়ারা ভজু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"আপনি শীগ্গির আসুন মাজী বড় বেমার।" আমি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কি হইয়াছে ভজুকে ভাল করিয়া প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হইল না,—শ্বশ্রুমাতার অনুমতি লইয়া তখনই লতাদের বাড়ী গেলাম ভজু আমাকে একেবারে লতার শয়ন গৃহে লইয়া গেল। গিয়া দেখি লতার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিকট শুনিলাম প্রভাত হইতে লতা শুইয়া ছিল,—আহারাদি করে নাই। বৈকালেও ঝি আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিল। ঝি গৃহকার্য্য করিতে লাগিল,—কিছুক্ষণ পর নির্ম্মল-কুমারকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর সে কোন গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে দেখিল নির্ম্মল সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। লতার গৃহে আসিয়া দেখিল অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতিত। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া আমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল। ঝির কথায়ও বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার স্বামীকে সংবাদ দিবার জন্য ভজুকে পাঠাইয়া দিয়া, লতার ভূলুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

৬।

দীর্ঘকাল শুশ্রূষার পর লতা চক্ষুরুন্মিলন করিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর দুই বাহু দ্বারা আমার গলদেশ আকর্ষণ করিয়া আমার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া,—"দিদি!" বলিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলাম "কি হয়েছে লতা ? অমন করছ কেন বোন ?"

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লতা বলিল,—"দিদি ! উনি আমায় ত্যাগ করেছেন—না—না দেবতার নামে মিথ্যা বল্‌ব না। আমি হতভাগিনী ক্ষণিক মোহের বশে অন্ধ হয়ে পাগল হয়ে তাঁকে হারিয়েছি।"

একি শুনিলাম! আমার আশঙ্কা কি এত শীঘ্র এই ভাবে সত্যে পরিণত হইল ? না—না অসম্ভব! এ যে একেবারেই অসম্ভব! আমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম,—

"লতা, সব কথা বুঝিয়ে বল বোন, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

লতা উঠিয়া বসিল, দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। লতা ধীরে ধীরে আমাকে সকল কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে কখনও শূন্য নয়নে সে আমার প্রতি চাহিল,—কখনও অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে সে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় বলিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে বলিয়া লতা সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। নির্ম্মলকান্তের আলমারী ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার কাপড় চোপড় গুলিও গুছাইয়া রাখিয়া যাইবে মনস্থ করিয়া আলমারী খুলিল। কাপড়গুলি নাড়িতে চাড়িতে একখানা অর্দ্ধ ছিন্ন পুরাতন পত্র তাহার হস্তগত হইল। পত্রখানি নির্ম্মলকুমারের নিকট একটি স্ত্রীলোকের লেখা। পত্রখানা পরে আমি সচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

"নির্ম্মল বাবু!

তুমি আর এস না কেন ? কাল সন্ধ্যার সময় আস্‌বে বলে গেলে আর এলে না। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলুম। তুমি আমায় ত্যাগ ক'রলে কেন ? তোমার পায়ে পড়ি দেখা দিয়ে যেও। ইতি তোমার হত ভাগিনী

বিনোদ"

পত্রখানির তারিখ লতার বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরের। —

পত্রখানি পড়িয়া লতার আপাদ মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। এ কি! সে যে তাহার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে! তবে এ কি? লতা যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পত্রখানা হাতে লইয়া সে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল গৃহ প্রবেশ করিল। লতাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল,—"একি গো! অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তোমার সব গোছান হোল?"

লতা কোন কথা না বলিয়া, পত্রখানা নির্ম্মলের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া, পাশ কাটাইয়া, দ্রুত পদে আপনার শয়ন গৃহে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর নির্ম্মল গৃহ প্রবেশ করিল,—লতা তখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। নির্ম্মল শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—

"লতা আমার একটা কথা শোন, আমার দিকে চাও। সব কথা শুনলে তুমি বুঝবে এতে তোমার রাগ ক'রবার কিছু নেই।',

লতা ফিরিল, কিন্তু স্বামীর বাহু পাশে কিছুতেই নিজেকে ধরা দিল না। বিশাল চক্ষু দুটি নির্ম্মলের চক্ষুর প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিল,—"কি বলবে? বলবার কিছু আছে কি? ব'লবার কিছু থাকলে অনেক আগে নিজেই বল্‌তে।"

নির্ম্মল বলিল,—

"অনেক কথা বল্‌বার আছে। ধীরেন্দ্র নামে আমার সহপাঠী বন্ধুর নাম হয়তো আমার মুখে শুনেছ। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ভরসা স্থল ছিল, লেখা পড়ায়ও সে খুব ভাল ছিল। হঠাৎ সে এই বিনোদিনীর কুহকে পড়ে অধঃপাতের পথ পরিস্কার ক'রতে আরম্ভ করে। এমন কি তাকে বিয়ে ক'রবে বলেও নাকি স্থির করে। আমি দেখলাম এক ধীরেন্দ্রর সঙ্গে সমস্ত পরিবারটি যায়,—আমি আর স্থির থাক্‌তে পারলাম না। আমি তখন বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলাম।"

লতার দিকে চাহিয়া নির্ম্মল দেখিল লতা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। নির্ম্মল বলিতে লাগিল—"প্রথমে সে আমাকে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিল। আমি তবুও হাল ছাড়লাম না। ধীরেণের অজ্ঞাত-সারে মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতাম। কিছু দিন পর দেখলাম বিনোদিনীর মন একটু একটু নরম হ'য়েছে। তারপর সে ধীরেণকে ত্যাগ ক'রতে সম্মত হোল; আমি তাকে কিছু অর্থ দিতে গেলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান ক'রলে দেখে বড় আশ্চর্য্য

হ'লাম। আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হোল—আমি সে দিন থেকে আর তার কাছে যাই নি। তারপর সে ঐ চিঠিখানা লিখেছিল বটে কিন্তু লতা তোমায় সত্যি বল্‌ছি আমি সে চিঠির কোন উত্তর দিই নি বা তার কাছে যাইনি এখন সব বুঝ্‌লে তো।"

শুষ্ককণ্ঠে লতা বলিল,—"না একটা কথা এখনও বুঝি নি। কি সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে তুমি আর যাও নি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নির্ম্মল বলিল,—

"বিনোদিনী আমাকে একটু একটু ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেছে বলে সন্দেহ হয়েছিল।"

শিহরিয়া উঠিয়া দুই হস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া লতা বলিল,—

"ছিঃ ছিঃ একথা আমার কাছে বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হোলনা, একটা পতিতা স্ত্রীলোক তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পেয়েছে। আর তুমি সেই চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছ! ধিক তোমাকে।"

বিস্মিত হইয়া নির্ম্মল বলিল,—"পত্র যত্ন করে রেখেছি কে বল্‌লে? আমার তো ও পত্রের অস্তিত্বও মনে ছিল না। কি ক'রে কাপড় চোপড়ের সঙ্গে আলমারীতে স্থান পেয়েছিল তাও আমি জানি না।"

লতা আপন কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল,—

'আমি যখন আমার প্রাণের সমস্ত প্রেম সঞ্চিত করে তোমার জন্য অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম, তুমি তখন একটা পতিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রেমের খেলা খেল্‌ছিলে? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ আঘাত পাবার আগে আমার মরণ হোল না কেন?"

কাতর কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল,—"তুমি এ কি বল্‌ছ? লতা—লতা, আমিতো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ক'রতে হোত তা নইলে সে আমার কে?"

কঠিন কণ্ঠে পাষাণী লতা বলিল,—"কে তা আমি জানি না—তবে এটুকু জানি সে তোমার কেউ না হ'লে এ ঘটনা তুমি আমার কাছে গোপন ক'র্‌তে না। নিজেই বল্‌তে, জিজ্ঞাসা ও ক'র্‌তে হোত না।"

নির্ম্মল বলিল,—"এই সব ঘটনার পর ধীরেন আমায় হাতে ধরে অনুরোধ করেছিল একথা যেন প্রকাশ না পায়। বন্ধুর কাছে কি ক'রে বিশ্বাস ঘাতক হ'ব লতা! তাই ইচ্ছা সত্বেও তোমার কাছে বল্‌তে পারি নি। এ যে আমার

নিজের কথা নয়,—পরের কথা বল্‌বার যে আমার কোন অধিকার নেই। তুমি বুঝতে পারছ না লতা ?”

দৃঢ় স্বরে লতা বলিল,—“না—আমি আর কিছু বুঝতে চাইনা,—যা বুঝেছি তাই আমাব পক্ষে যথেষ্ট !”

ব্যথিত স্বরে নির্ম্মল বলিল,—“লতা ! তুমি কি সেই লতা ! এত কঠিন তুমি ! উঃ ভাবিতেও পারি না। লতা, একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, না হলে আমাদের সুখ সূর্য্য অস্ত যেতে বেশী দেরী হবে না। কি আর বল্‌ব ?”

৭

লতা বলিলে লাগিল,—

“উনি চলে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবতে চেষ্টা ক’রলাম কিন্তু কিছুতেই মন টাকে যেন স্থির ক’রতে পারলাম না। যতই ভাবি ততই যেন চিঠিখানা আমার চোখের সাম্‌নে আমায় বিদ্রূপ ক’রে নাচতে লাগল। আর উঠতে ইচ্ছা হোল না, খেতে ইচ্ছে হোল না। উনি আজকার দিনটা আগেই ছুটি নিয়েছিলেন, স্নানাহার করে—ভগবান জানেন কি খেলেন-উনি এই পাশের ঘরে গেলেন। মাঝে মাঝে পায়চারী ক’রে বেড়াতে লাগলেন—শব্দ কাণে গেল। আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। বিকালে উনি আবার এলেন,—বিছানার পাশে এসে ডাকলেন, “লতা !” আমি চুপ ক’রে রইলাম। দিদি ? আমি পাগল হয়েছিলাম না হ’লে কি সেই আদরের ডাক উপেক্ষা ক’রতে পা’রতাম ? কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন,—“এখনও রাগ ক’রে থাকবে ? সেই অটল বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তে এই ভীষণ অবিশ্বাসে কি ক’রে পরিণত হোল ! এত কঠিন কি ক’রে হ’লে ! লতা ! একবার বুকে এস—একবার বল সব ভুলে গেছ। সব অন্ধকার ঘুচে যাক।” দিদি, পাষাণী আমি, নিষ্ঠুর আমি, নারী নামের অযোগ্যা আমি, তবু চুপ ক’রে র’ইলাম। তিনি বাহু প্রসারিত ক’রে আমার বুকে টেনে নিতে এলেন,—আমি স’রে গেলাম। মানুষের আর কত সয় ? আর একটা তুচ্ছ নারীর জন্য কেনই বা সহ্য ক’রবেন, দরিদ্রের কুটীর থেকে তুলে নিয়ে মাথার মণি ক’রেছিলেন,—আদর দিয়ে মাথায় তুলে ছিলেন। সব কথা ভুলে গেলাম।

লতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—“এত ঘৃণা ! এত ক’রে বোঝালাম তবু বিশ্বাস হোল না ? এত প্রেম এক মুহূর্ত্তে ঘৃণায় পরিণত হোল একটা

কল্পনা প্রসূত কথা নিয়ে ! তবে তাই হোক, আমি চল্‌লাম। আর তোমার সঙ্গে দেখা হ’বে কি না জানি না। যদি ভগবান রক্ষা করেন ও তোমার ভুল তুমি বুঝতে পার তবেই দেখা হবে, নচেৎ নয়।” এই বলে তিনি টল্‌তে টল্‌তে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ’লেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। একি হইল ! একি করিলাম ! আমি কি পাগল হইয়াছি ? সামান্য সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার মত স্বামীকে অপমান করিলাম ! এমনটা হইবে তাহা তো ভাবিতে পারি নাই। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম, কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম,—“ওগো, ফিরে এস ! আমি সব ভুলে গেছি।” কিন্তু হায়, শূন্য ঘরে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া আমারই কানে ফিরিয়া আসিল। তিনি তৎপূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ভাবিলাম তাঁর ঘরে গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনি, কিন্তু পা চলিল কই ? অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় আপাদ মস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল,—পরক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাল। দিদি ! দিদি ! তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন না ? একবার তাঁকে ডাক না দিদি, পায় ধরিয়া ক্ষমা চাই।”

আমি তাহাকে সাধ্যমত আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম,—“নির্ম্মলবাবু এখন একটু বাইরে গেছেন বোন, তিনি এলেই তোমার কাছে আস্‌বেন। তোমায় ক্ষমা ক’রবেন বৈকি ! তোমায় কত ভালবাসেন তাকি জান না ?”

“জানি, দিদি, জানি—তাইতো এত সাহস পেয়েছি।” লতার অশ্রু জলে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। আমার স্বামী আসিলেন। তাঁহাকে নির্ম্মলের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া লতার নিকট আসিয়া বসিলাম। অনেক কষ্টে তাহাকে একটু দুগ্ধ পান করাইলাম, সমস্ত দিন অনাহারে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—দুগ্ধ পান করিবার অল্প পরে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

শ্রাবণ মাস,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সেই বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। আমি আমার হৃদয়ে বিরাট অন্ধকার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর লতা জাগিল, চক্ষুরুন্মিলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তিনি কি এসেছেন দিদি ?”

আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম,—"না, এখনও আসেন নি, এই এলেন ব'লে।"

লতা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—তাহার সেই নিশ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! সরলা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? আমার স্বামী ফিরিয়া আসিলেন,—তিতি প্রথমেই ষ্টেশনে নির্ম্মলের সংবাদ করিবার জন্ত গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন নির্ম্মল এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়া পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম, আমার স্বামী বলিলেন, "কিছু ব্যস্ত হোয়ো না আমি কাল নিজে এলাহাবাদ গিয়ে তাকে ফিরিয়া নিয়ে আস্‌ব।"

লতাকে আর কিছু জানাইলাম না,—বিপদের উপর বিপদ লতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি আর তাহার নাই। আমি আর গৃহে ফিরিতে পারিলাম না। খোকাকে রাত্রে একটু দেখিবার কথা স্বামীকে বলিয়া দিয়া লতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। চিকিৎসক ও ধাত্রীর জন্য লোক পাঠাইলাম।

সমস্ত রাত্রি ক্লেশভোগের পর, উষার তরুণ আলোক যখন সবে মাত্র আকাশ প্রান্তে উঁকি দিয়াছে, সেই সময়ে লতা, অসময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। লতার পুত্র ঠিক যেই মুহূর্ত্তে এই পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি মালগাড়ীর সহিত উর্দ্ধগামী পাঞ্জাব মেলের ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া বহু যাত্রী প্রাণ হারাইল। পরদিন সংবাদ পত্রে মৃতের তালিকায় সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মলকান্ত রায়ের নাম প্রকাশিত হইল। লতার সব ফুরাইল। দুঃসম্বাদ পাইয়া লতার মাতা ছুটিয়া আসিলেন। শোকার্ত্ত জমীদার দম্পতির স্থানত্যাগের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। লোক পাঠাইয়া তাঁহার বধূর তত্ত্বাবধান করিলেন। লতা ছিন্ন লতিকার মতই দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন একমাসের ক্ষুদ্র শিশুটিকে মার কোলে তুলিয়া দিয়া, উদ্দেশ্যে শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন লতা পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে মহাযাত্রা করিল।

বিদায়

[শ্রীশ্রীধর শ্যামল]

ওগো পান্থ! রাখ বীণা কণ্ঠ হোক্ গীত-হীনা
অন্ধ তমসায়;
এবার বিদায়!
ফেণ-শুভ্র নদীতীরে অন্ধকার নামে ধীরে
যাত্রা হল শেষ,
উদাস-গগনভাগে মদিরার রাগে জাগে
আধ তন্দ্রাবেশ,
পথশ্রান্ত বধূ ওকে চলেছে চপল চোখে
শঙ্কিত চরণ?
মৌনদিন ম্লান হেসে কোন্ মন্ত্রময় দেশে
লভিল শরণ;
দুরে ক্লান্ত তরী খানি ধীরে স্বপ্নাঞ্চল টানি
নিঃশব্দে ঘুমায়,
বল পান্থ! বল তবে, বল শ্রান্ত গীতরবে
বলগো বিদায়!
সুরে সুর মিলাইয়া ধ্বনিয়া তুলেছে হিয়া
মোহময় বীণ—
তব সাথে বড় সুখে কাটায়েছি হাসি মুখে
সারা দীর্ঘদিন;
গগন পবন মাঝে এবার শোন গো বাজে
শোন ওকি সুর,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা— ক্ষণিকের ভালবাসা,
ক্ষণিক মধুর;
বল বন্ধু—বল তবে, বল শ্রান্ত গীতরবে,
বল তবে হায়।
বিদায়! বিদায়!

বুকে যদি জাগে ব্যথা— ভাঙ্গি মূক নীরবতা
কয়োনাক ভাই ;
চোখে যদি জাগে বারি— স্মৃতিদ্বার অপসারি
সুখে রেখো তাই ;
এজগতে যত হাসি, যত ভাল বাসা বাসি
যতেক ক্রন্দন
বিদায়ের আঁখিধারে গড়ে হৃদয়ের তারে
মধুর বন্ধন ;
বল পান্থ ! বল তবে— বল শ্রান্ত গীতরবে
বল তবে হায় !
বলগো বিদায় ।
নিশাশেষে ম্লান শশী নীলিমায় যাবে মিশি
ছিঁড়ি মায়াজাল ;
নবীন অরুণ ধীরে আসিবে গগন তীরে
তুলি স্বর্ণপাল ,
তখন হবে কি দেখা ? ওগো পান্থ ! ওগো সখা !
এই কিনারায় ?
এবার বিদায় !

কথাবার্ত্তা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ]

(আইভান্ টুর্গেনিভ হইতে)

আল্‌প্সের উচ্চতম দুটী চূড়া—ইয়ংফ্রাউ ও ফিন্‌স্‌টেরেয়ার্‌হর্ণ * * * * * এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো খাড়া পাহাড়ের যেন লম্বা একটা শৃঙ্খল * * * * একেবারে পর্ব্বতের অন্তরতম দেশ।

পর্ব্বতের উপর ম্লান সবুজ মূক গগনতল। চারিদিকে হাড়কাঁপানো নিষ্ঠুর করকাপাত ; কঠোর উজ্জ্বল বরফের স্তূপ—তারই মাঝ থেকে ধ্যান-প্রশান্ত তুষারমণ্ডিত পবনপ্রতিহত দুটী চূড়া মাথা উঁচু করে আছে।

দুটো প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, দিক্‌চক্রবালে যেন দুটো রাক্ষস !

ইয়ংফ্রাউ প্রতিবেশীকে বললে, 'নূতন খবর আছে কিছু ? তুমিত আমার চেয়ে দেখতে পাও বেশী। নীচে ওটা কি ?'

হাজার বছর কেটে গেল, তাদের সেটা এক মুহূর্ত্ত। ফিন্‌স্ তখন বজ্রনির্ঘোষে উত্তর দিলে, 'পৃথিবীর উপরে একটা ঘন মেঘের পর্দ্দা দুলছে একটু র'সো।'

আবার হাজার বছর কেটে গেল, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর ?'

'ব্যাপার ত দেখছি একই রকম। নীল সলিলের রাশ, কালো জঙ্গল, আর পাঁশুটে রংএর পাথরের চাঁই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুপেয়ে পতঙ্গগুলো গোলমাল করে বেড়াচ্চে;—এপর্য্যন্ত তারা তোমায় বা আমায় স্পর্শের দ্বারা কলঙ্কিত করতে পারেনি।'

'মানুষ ?'

'হাঁ, মানুষ।'

আবার হাজার বছর যায়, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর, বন্ধু ?'

ফিন্‌স্ মেঘমন্দ্রে উত্তর দিলে, 'এখন যেন পোকাগুলো একটু কম ; নীচেটাও একটু বেশী পরিষ্কার দেখাচ্চে, জল শুকিয়ে এসেছে, জঙ্গল কমে এসেছে।'

আবার হাজার বছর কেটে গেল, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি দেখছ, ভাই ?'

ফিন্‌স্ জবাব দিলে, 'আমাদের কাছটা বেশ পরিষ্কার, কিন্তু ঢালু জমি কোলে অনেকদূরে বেশ যায়গাগুলি, কি যেন গড়চে সেথায়।'

আবার হাজার বছর যায়—তাদের এক মুহূর্ত্ত।

তখন ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর ?'

ফিন্‌স্ জবাব করলে, 'ভাল খবর————এখন সব পরিষ্কার, যেদিকে চাই—সব সাদা * * * আমাদের মত চারিদিকেই তুষার—অবিচ্ছিন্ন তুষারের রাশ। সব জমে গেছে। এখন সব ঠাণ্ডা, সব শান্ত।'

ইয়ংফ্রাউ বললে, 'বেশ, বন্ধু, অনেক গল্প হলো আমাদের, এইবার এসো আমরা ঘুমুই।'

'হাঁ, ভাই, এসো ঘুমোনো যাক্।'

বিরাট্ পর্ব্বত ঘুমিয়ে পড়ল; পরিষ্কার সবুজ গগনতলও সেই অনন্ত স্তব্ধতার দেশের উপর ঘুমিয়ে পড়লো।

জাতীয় উন্নতির ভিত্তি

(শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন)

আজ আমাদের চোখের সামনে যাহাই আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমরা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছি। আমাদের একটি বারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই যে আমরা কি লইতেছি আর কি ফেলিয়া দিতেছি! কি মহারত্ন আমাদের জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল আর কি নগণ্য পদার্থ আজ সেই রত্নভাণ্ডারের ভাস্বর শ্রী নষ্ট করিতে বসিয়াছে! আগাছায় ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে হতশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ উক্তির "লক্ষ্য কি বা কে?" এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে। কিন্তু উত্তরেরও অনুসন্ধানে বহুদূরে যাইতে হইবে না। উত্তর নিজেরই গৃহে উত্তর নিজেরই হৃদয়ে। আমার কি আছে আর কি নাই "তা আমি ভাল রকমেই জানিতে পারি, যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে; "আমার কি ছিল আর আজ কি হারাইয়াছি" ইহার অনুসন্ধান জন্য একটা বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় কেবল একটা প্রবৃত্তির, একটা আকাঙ্ক্ষার। সেই প্রবৃত্তিকে সেই আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু সে প্রবৃত্তি হয় কৈ? আকাঙ্ক্ষা জাগে কৈ? আকাঙ্ক্ষাজাগরণের একটা উত্তেজক কারণ চাই। সে কারণটা কি? ধরিত্রীর কোন্ অংশে আমাদের জন্ম? কোন্ অংশ ঋগ্বেদাদি মহার্ঘ শাস্ত্র নিচয়ের উজ্জ্বল-বিভায় অরুণোদয়সমুদ্ভাসিত পূর্ব্বাকাশের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল? কোথায় ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, দর্শন বিজ্ঞানের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সম্ভারে বাণীর চরণকমল অর্চ্চিত হইয়াছিল।

একবার সেই অতীতের গৌরবময়ী স্মৃতিকে মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া মৈত্রীকরুণার পূত ধারায় সিক্ত তপোবনগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইতে হইবে। একবার বর্ত্তমান-যুগ-মোহের আবরণ ভেদ করিয়া নির্ম্মল দৃষ্টিতে

নিজের স্বরূপটিকে দেখিতে হইবে। তবেই অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে, তবেই অতীতের স্নিগ্ধ মাধুরীটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। তখনই উত্তর মিলিবে, তখনই এই দারুণ সমস্যার একটা সমীচীন মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অবসর আমাদের নাই, সে চেষ্টাও আমাদের নাই। অনুসন্ধিৎসাকে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সকল অনুষ্ঠানের পথে, সকল করণীয়ের মাঝখানে একটা "জিজ্ঞাসাকে" খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে। যাহা লইতেছি, যাহার মোহে ভুলিতেছি সেটা কি? তাহার উপযোগিতা কি? তাহার ভিত্তি কোথায়?

"পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা" বড়ই ঘৃণিত। ভাল হইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, মন্দ হইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। "পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি" হইয়া ভালমন্দ কোন মতকেই নিজের করিয়া লওয়া ভুল এবং সেই মতকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ঘোষণা করা আরও ভুল, তাহাতে ধ্বংসের পথটাই বিস্তৃত হয় মাত্র উন্নতির আশা আদৌ থাকে না; একটা জাতির সৌভাগ্যময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলা যায় না।

ঐ "পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিতা" আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির একটা-বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা রোগের মত জাতির বুকের মধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়াছে।

সেই রোগটির সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। যে "জিজ্ঞাসা" প্রাচীন আর্য্যগণের মজ্জাগত ছিল, তাঁদের জাতীয় জীবনের একটা মুখ্য লক্ষণ ছিল, সেই জিজ্ঞাসাকে সকল কাজের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে।

আমি কোন মতকেই নিন্দা করিতেছি না, হেয় বা অনুপাদেয় বলিয়া কোন মতকেই উড়াইয়া দিতেছি না। আমি বলিতেছি বিচার করিয়া দেখিতে; স্বয়ং তার সত্যতা, তার উপাদেয় নির্ণয় করিতে।

আমাদের যা ছিল বা এখনও যা আছে তা আমরা ত্যাগ করি কেন? প্রাচীন আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যা ছিল তা না দেখিয়া, না বিচার করিয়া ছুড়িয়া ফেলি কেন? তার হেয়ত্ব বা অনুপাদেয়ত্ব প্রমাণ করিয়া ত্যাগ করিলে ভাল হয় না কি?

একদিন যাহা সুখের ছিল, একদিন যাহা ভারতবক্ষে স্নেহের, ধর্ম্মের, ও পবিত্রতার পুণ্য প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিয়াছিল; একদিন যাহা মানব-সমাজে সুখ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি বহন করিয়া আনিয়াছিল; আজ তাহার উপাদেয়ত্ব

গেল কোথায়? আজ তাহা একটা বিকট অনভ্যর্থিতের মূর্ত্তি লইয়া আমাদের ভীতি উংপাদন করিতেছে কেন? কেনই বা তাহাকে অবজ্ঞা করি? কেনই বা সেই প্রাচীন কথায় একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি চোখে মুখে ভরিয়া রাখি? একি কম পরিতাপের বিষয়!

বিনা কারণে একটা বস্তুকে দোষান্বিত বলিয়া ত্যাগ করা, অথবা পূর্ণ ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া তাহার স্পর্শ হইতে আপনাকে সরাইয়া দেওয়া কি যুক্তিসিদ্ধ।

একদিন আর্য্যগণ উন্নতির দুরারোহ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন; সেটা বোধ হয়, আলোচনা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে আমাদের ঔদাসীন্যের মর্য্যাদার উপর হাত পড়িবে না; আমাদের "অবজ্ঞা ব্রত" ভঙ্গ হইবে না।

আজ হয়ত আমরা অবজ্ঞা পূর্ব্বক উড়াইয়া দিব, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনে এমন একদিন গিয়াছে যখন তাঁহারা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মত যা দেখিয়াছেন তাহাতেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া অতি বিজ্ঞের মত হাসি থামাইয়া রাখিতে পারি না।

কিন্তু একদিন তাঁহারা কালো গরুর বাট হইতে সাদা দুধ ক্ষরিত হইতে দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে ধেনুর কত স্তুতিই না করিয়া ছিলেন। এবং এই ব্যাপারে একটা তাঁহারা দৈবলীলার অস্তিত্বের অনুমান করিয়াছিলেন।

অমুকদিন অমুক সময়ে (রাত্রি ৯৷৷০ কি ১০ টার সময়) পূর্ব্বাকাশে একটি নক্ষত্রের উদয় হইবে আমরা এইরূপ গণনা করিয়া বলিয়া থাকি। সূর্য্যের উদয় অস্তের মধ্যে আমরা বিস্ময়ের কোন কারণই দেখিতে পাই না,—"ইহা ত নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি?" কিন্তু সেই দূর অতীত যুগের মানুষগুলি এই সমস্ত ব্যাপারকে একটা দৈনন্দিন সামান্য ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তাঁহারা একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কি ইহা? কোথা হইতে আসিতেছে কোথায় বা যাইতেছে?" এইরূপ "জিজ্ঞাসার" একটা সুসঙ্গত উত্তরের জন্য তাঁহাদের চিন্তার স্রোত ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। আজও সেই প্রশ্নের ধ্বনি আমরা যন্ত্ররাশির মধ্যে শুনিতে পাই।

শত শত নদীর উচ্ছলিত জলরাশি সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে তবুও সমুদ্র পূর্ণ হইতেছে না! কিন্তু ইহা শিশুর স্বভাব সুলভ বিস্ময় নয়, এই বিস্ময়ের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল একটা অমানুষিক পর্য্যবেক্ষণ প্রযত্ন। সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একটা অলৌকিক আত্মচেষ্টা! প্রতিক্রিয়া বা গতির অন্তরালে লুক্কায়িত একটি অদৃশ্য হস্তসঞ্চালন, একটি চেতন-প্রেরকের দুরনুমেয় অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। জীবন সঙ্ঘের মধ্যে একটা পরিস্ফুট গতি বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সেই দর্শনই তাঁহাদিগকে কল্পনার রাজ্যে একটা সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিল এবং সেই পরিচালনা বা প্রেরণার ফলে তাঁহারা প্রতি নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালে দ্যৌ বরুণ, সূর্য্য, সবিতা পুষণ প্রভৃতি দেবতার অদৃশ্য পরিচালনাশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্রিয়ার মাঝখানে তাঁরা একটা শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, এই গবেষণা তাঁহাদিগকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল, বহু অদ্ভুত সত্যের, বহু অত্যদ্ভুত তত্ত্বের নির্ণয়ে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতীত ও বর্ত্তমান উভয়কে লইয়া হইতে পারে নাকি? সেই বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডে অতীতের অভ্যুদয়ের গুরুত্ব নির্ণয় কি পণ্ডশ্রম হইবে? অতীতের প্রতি অন্ধ হইয়া কেবল বর্ত্তমানের প্রতি চক্ষুষ্মান হইলে লাভ কি?

উদ্দেশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধান করা; একটা নূতন কিছু করা নয়! ভাল মন্দ বিচার না করিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইয়া পুরাতনকে ত্যাগ করা নয়! বিচারপূর্ব্বক ভালটিকে লওয়াই আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা "পুরাতন" হইতেই হউক আর "নূতন" হইতেই হউক। নূতনকে ভাল বা মন্দ বলিবার আগে পুরাতনকে চোখের সামনে আনিয়া ধরিতে হইবে, তার প্রত্যেক বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নূতনের সহিত তার তুলনা করিতে হইবে; তার পর তাহার হেয়ত্ব দেখিলে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, উপাদেয়ত্ব দেখিলে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। প্রতি পদে, প্রতি চিন্তায় প্রত্যেক বিচারে মনে রাখিতে হইবে সমাজের "উন্নতিই" আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হারাইলেই বিচার যুক্তি তর্ক সব নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "উন্নতি কি ? যে জাতীর জীবন আদর্শস্থানীয় হইবে তাহার স্বরূপটি কেমন হইবে ? কেমন রূপ লইয়া তাহা আমাদের চোখের সামনে লক্ষ্যরূপে অবস্থান করিবে ?" তাহাও আমরা জানি না। সেই লক্ষ্যটিকে আমরা কোন্ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাও ত একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমাদের লক্ষ্যটিকে পুরাতন ছাঁচে ঢালিব না নূতন ছাঁচে ঢালিব ?" ইহাই প্রথম সমস্যা, এবং ইহার সমাধানও উভয়ের তুলনার উপর নির্ভর করিতেছে। জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে কোনটা 'হিত' আর কোনটা 'অহিত' ইহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। কারণ একটা জাতির মঙ্গল কিসে বা কোথায় নিহিত রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বহু অভিজ্ঞতা বহু সাধনা ও বহু তুলনার প্রয়োজন হয়। এখনই—এখনই ঝাঁ করিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশ করিলেই হয় না।

আমাদের দেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনকার ভাব (idea) ভাষা সভ্যতা সবই অন্যরূপ হইয়াছে। আছে কেবল সেই দেশটি কিন্তু সে মানুষ আর নাই, যেন বৈদেশিকের মত আসিয়া এই আর্য্য ক্ষেত্রে আমাদের বসতি স্থাপন করিয়াছি।

শিক্ষা, দীক্ষা সংস্কার, ধর্ম্ম সকলেরই ক্রমবিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। এই যে ক্রমবিকাশ ইহা স্বাভাবিক, ইহার গতিও দুর্ব্বার। বৈদিক যুগের পর হইতে এই ক্রমবিকাশের মূর্ত্তি কত রূপই না ধারণ করিল। পৃথিবীর মধ্যে কোন কিছুই নিশ্চেষ্ট নয়; কোন কিছুই জড়ের ন্যায় মৃতবৎ একই ভাবে যুগ যুগান্তর পড়িয়া থাকে না। সকলের মধ্যেই একটা গতি, একটা ক্রিয়া সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। তাই এই ভাবান্তর। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই ভাবান্তর পরিগ্রহের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রহিয়াছে। ইহা একেবারেই ন্যায়ের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া হয় না, হইতে পারেও না।

দেশ, কাল, পাত্র ও বৈদেশিক বা বাহ্য প্রভাব বশতঃ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নূতনত্ব দেখা যায়; এই পরিবর্ত্তন ধারার চিরন্তনী গতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে না, বিচারপূর্ব্বক আপনার কার্য্যপ্রণালীকে পরিচালিত করিবার শক্তি হারায় না। সে আপনার আপনত্বটুকু (individuality) বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করে তারই ফলে এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই নিজস্বটুকু আরও পরিস্ফুট, সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। কিন্তু

নিজেকে একবার হারাইয়া ফেলিলে আর তাহা সম্ভবপর হয় না। আমরা সেই 'নিজস্বটি' হারাই ফেলিয়াছি; সেই প্রাচীন আদর্শ হইতে নিজকে অনেক দূরে টানিয়া আনিয়াছি। মূল ভিত্তি বা আশ্রয়টির মধুময় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে সবলে বিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। সেই মূলটিকে অক্ষত রাখিয়া জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির দিকে স্থির লক্ষ্য সংস্থাপিত করিয়া পুষ্টির পথে অগ্রসর হইলে বোধহয় এমনটা হইত না। বোধ হয় এখন শোচনীয় রূপান্তরে পরিণমিত হইতাম না।

আমরা গোড়ায় গলদ করিয়া ফেলিয়াছি, নিজেকে বাদ দিয়া নিজের জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছি; তাই আজ চিনিতে পারিতেছি না "আমরা কে ? আমার কি ছিল আর আজ আমরা কি হারাইয়াছি।" আমরাই আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য হারাইয়া আমাদের উন্নতির পথ চিরকালের মত কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছি। আমরা নিজেকেই ভুলি। গিয়াছি।

তাই বলিতেছি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে প্রাচীনের দিকে তাকাইতে হইবে, সেই প্রাচীনকে লইয়া নবীনের সহিত তুলনা করিতে হইবে এবং তাহাকে ত্যাগ না করিয়া, তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া যা কিছু ভাল যাকিছু উপাদেয় তাই দিয়া জাতীয় জীবনকে পুণ্যশ্রী মণ্ডিত করিতে হইবে। প্রাচীনের প্রতি এই প্রীতিটুকু শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-টুকু আমাদের দেখাইতে হইবে।

যে জাতির জীবনের প্রতিষ্ঠানের মূলে ধর্ম্ম পূর্ণ অবলম্বন রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জাতিই উন্নত হয়। পরকল্যাণবুদ্ধি যে জাতির জীবিত-স্পন্দন, সমদর্শন যে জাতির মজ্জাগত, পরের জন্য আর্ত্ত পতিতের জন্য যে জাতির জীবনের "উৎসর্গ" সেই জাতি উন্নতিশীল, সেই জাতির অন্তর্বাহ্য অক্ষয় কবচে সুরক্ষিত।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪২)

রাখুর প্রতি সমবেদনায় অতি আগ্রহে নির্ম্মলা কতকগুলা ভুল করিয়াছে। বুদ্ধিমতী হইয়াও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে।

প্রথম ভুল রাখুকে ধরিয়া আনিতে শুভাকে বহির্ব্বাটিতে পাঠানো। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রজেন্দ্রের বাটিতে আব্রুর অভিমানটা বড় বেশি ছিল। সে সময়ের বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই শুভার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছিল যদিও ঝড়ের জন্য তখন বাহিরে কোনও লোক ছিল না, তথাপি শুভার মাকে তুষ্ট করিতে নির্ম্মলাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। রাখুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ, যেটা সে কাহারও কাছে বলিবেনা স্থির করিয়াছিল, আদ্যোপান্ত শুভার মাকে শুনাইতে হইয়াছে।

সে শুনানোটা হইল তার দ্বিতীয় ভুল। শুভার মা সে কথা গোপন রাখিতে পারে নাই। আপাততঃ সে কথা সরি শুনিয়াছে। আর তখন পাড়ার লোকের সে কথা শুনিতে বড় বিলম্ব হইবে না।

চারুর মৃত্যুতে রাখুর অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা তুলিয়া শুভার মাকে প্রলুব্ধ করাও তার মস্ত ভুল। সে যে মরিয়াছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা তার উচিত ছিল না। আর মরিলেও, রাখুই যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইবে, এটাও মনে করা তার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল।

আর একটা বড় ভুল হইয়াছে। শ্বাশুড়ীর কাছে শুভার সঙ্গে এই দরিদ্র পূজারির বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা। সেটা করিবার আগে স্বামীর মতামত জানা নির্ম্মলার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যছিল। তার বুঝা উচিত ছিল, ব্রজেন্দ্র যদি এ বিবাহে অমত করে, তা হইলে তার কিম্বা তার শ্বাশুড়ীর সম্পূর্ণ মতেও এ বিবাহ হইবে না। তবে একটুকু মন্দের ভাল, রাখুর কাছে সে প্রস্তাব তুলিতে তুলিতে তার তোলা হয় নাই।

কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ভুল করিয়াছে সে, সকলের অজ্ঞাতসারে রাখুর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ পাতাইয়া। সেই জন্য বহুবার সে তাহার কাছে যাতায়াত

করিয়াছে, বহুবার নির্জ্জনে আলাপ করিয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধের কথা সাহস করিয়া, কাহারও কাছে সে প্রকাশ করে নাই। শ্বাশুড়ী কিম্বা ঝিকে তারই মত সরল মনে করা তার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। এই আলাপের জন্য সে নিজের পুত্র কন্যার যত্ন লইতে ভুলিয়াছে। শুভার আঘাতেও তার যত-টুকু দেখা শুনা উচিত ছিল, তার কিছুই এক রকম করিতে পারে নাই।

এই ভুল গুলা নির্ম্মলার অগোচরে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রা-আহারান্তে নির্ম্মলা কন্যাকে লইয়া একটু বিশ্রাম লইতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তার ঘুম ভাঙে নাই। রাখুও ঘুমাইতেছিল।

সরি ইহার মধ্যে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া আসিল। তখনও কলিকাতায় দুই দশ ঘর বহুকালের প্রতিবেশী লইয়া এক একটি পল্লী ছিল। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পরস্পরে একরূপ সংলগ্ন দুই খানি বাড়ীর লোক এখন অনেক সময়েই কেহ কাহাকেও চিনে না।

বেড়াইতে গিয়া সরি দুই একটি প্রতিবেশিনীর কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রত্যেকেই অপরের কাছে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। ঘরে ফিরিয়া দেখিল, ঠাকুর মা উপরের বারান্দার এক পার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। সে একটু আগে শুভার নাক পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছে তার জ্বর হইয়াছে, নাকও একটু ফুলিয়াছে।

তার বিমর্ষতা দেখিয়াও না দেখিয়া সরি বলিল—"তাগা না নিয়ে, ঠাকুর মা, ছাড়বো না কিন্তু।"

"নে বাপু, আর জ্বালাস নি।"

"সে কিগো! ঠাকুর মশাইকে জামাই করা কি তোমার ইচ্ছা নয়?"

"আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় আসে যায় কি সরি!"

"তা ব'লে তোমার অমতে কি এরা বিয়ে দিতে পারে?"

"দিলে আমি কি করতে পারি।"

সরি ক্ষণেক নীরব রহিল। বুঝিল তার অনুপস্থিতি সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু একটা গোল বাধিয়াছে।

শুভার মাও ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে বলিল—

"মেয়ের কপালে পোড়া বিধাতা যে কি লিখেছে তা বুঝতে পারছি না।" এই কথাতেই একটু আশ্বাস পাইয়া, এদিক ওদিক একবার চাহিয়া সরি বলিল—

"তা যদি বললে ঠাকুর মা, তা হ'লে বলি, যদি অনেক বিষয় সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকতো—"

"তুই যেমন ক্ষেপি, বিষয়কি পাব বললেই পাওয়া হ'ল। এখন আমার মেয়ে বাঁচলে বাঁচি। হতভাগা বামুন কি ক'রে যে মেয়েটার নাকে মারলে!"

তার কথায় সরি একটু সাহস পাইয়া বলিল—"তা হ'লে বলি ঠাকুর মা, ও বাড়ীর শ্যাম বাবুর মা একথা শুনে বললে, তার চেয়ে তোদের বাবু মেয়েটার গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিক্ না।"

"তাকে এখন একথা বলতে গেলি কেন?"

"তোমাদের মেয়ে দেওয়া ঠিক হয়ে গেল, বলতেই আমার যত দোষ!"

"ঠিক হয়ে গেল তোকে বললে কে?"

"এইত দেখছি ঠাকুর মা!"

পুঁটি কোলে এই সময় নির্ম্মলাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উভয়েই চুপ করিল। শুভার মা কেবল একবার অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া লইল—"ব্রজেন্দ্র আসুক, এখন কোথায় কি।"

সরি তার ঠাকুরমা'র মত মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। মধুসূদনের একটু মেয়েলি স্বভাব মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পারিলে গল্প গুজব হাস্য-পরিহাসে এমন সে মগ্ন হইত যে, সে জন্য অনেক সময় সব কর্ত্তব্যই সে ভুলিয়া যাইত। নির্ম্মলার মত মেয়ের কাছে সেটা ভাল বোধ না হইলেও সরি কিম্বা শুভার মা তাহাতে কোনও দোষ দেখিত না।

রাখুর স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। গম্ভীর না হইলেও নিতান্ত অল্পভাষী, সে শুধু আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইত। রাখুর বিরুদ্ধে কাহারও কোনও কথা কহিবার না থাকিলেও, প্রগল্‌ভতা দোষের জন্য মধুকে ছাড়াইয়া দেওয়ায় সরি ও শুভার মা উভয়েই নির্ম্মলার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

তবে যে শুভার মা রাখুকে কন্যা দিতে অমত করে নাই, সেটা কতক সহসা-জাগ্রত অর্থের প্রলোভনেও বটে, কতকটা নির্ম্মলার কথার প্রতিবাদে সাহসের অভাবেও বটে। সে ছিল বাল-বিধবা, এদিকে সে নির্ম্মলার একরূপ সমবয়সী, বড় জোর তিন চারি বৎসরের বড়—সর্ব্বপ্রকারেই ইহাদের উপর তার নির্ভর। অল্প বয়সের বিধবা বলিয়া নির্ম্মলা সর্ব্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিত। ব্রজেন্দ্রর কাছে মায়ের সমস্ত মর্য্যাদা লাভ করিলেও, নির্ম্মলাও তাহাতে শ্বাশুড়ীর যোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইলেও নিজের বয়সও অবস্থায় সর্ব্বদাই

সে অনেকটা সঙ্কুচিত থাকিত। বিশেষতঃ তার বৃদ্ধ স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে এমন কিছু অর্থ অথবা সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যায় নাই, যাহাতে সে ব্রজেন্দ্র কিম্বা নির্ম্মলার সঙ্গে আপনাকে সমান অবস্থাপন্ন মনে করিতে পারে। স্বামী তাহাকে ব্রজেন্দ্রের মহত্ত্বের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলাকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"যা সরি, এরা যদি জলেই মেয়েটাকে ফেলে দেয় আমি কি করতে পারি।"

"সরি!" নির্ম্মলা দূর হইতেই ডাকিল। "ঠাকুর মশাই উঠেছেন কি না একবার দেখে আয়।"

"দেখে এসেছি, ওঠেন নি।"

শুভার মা বলিল—"কাল রাত্রে ঠাকুর বোধ হয় চোখের পাতা ফেলবার অবকাশ পায়নি।"

সরি একটু হাসিয়া বলিল—"এইমাত্র নাকডাকা শুনে আসছি মা।"

"হাত-মুখ-ধোওয়া জল, তামাক সব ঠিক ক'রে রাখ।"

সরি চলিয়া গেল।

এইবারে শ্বাশুড়ীর কাছে আসিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নালু কোথায় গেল মা?"

মনে মনে শুভার মা'র রাগ হইল। বউ বামুনের খবর লইল, ছেলের খবর লইল, কিন্তু শুভার খবর লইল না। অথচ নিজেই সে মেয়েটার দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। সে বলিল—"কোথায় সে আমি জানি না। আমিও তাকে খুঁজছি।"

"কেন মা?"

"তাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাতুম। শুভার নাক ফুলেছে, একটু জ্বরও হয়েছে।"

কোন উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা শুভাকে দেখিতে গেল। তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে বুঝিয়া সে মনে মনে একটু লজ্জিত হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিল, শুভা বিছানার উপর বসিয়া আছে। মুখ তার ছিল উপর দিকে।

"হতভাগা মেয়ে তোমাকে উঠতে বললে কে? ডাক্তার না তোকে নড়তে চড়তে বারণ করে গেছে?" বলিয়াই পুঁটিকে শয্যায় রাখিয়া নির্ম্মলা শুভার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। বুঝিল গা তার সামান্য গরম হইয়াছে বটে। নাক ও অল্প ফুলিয়াছে। কিন্তু মন তার সে জন্য কিছুমাত্র ভীত হইল না। তাহার মন বলিল, হাতই লাগুক কিম্বা কনুইই লাগুক অন্যমনস্ক ব্রাহ্মণের আঘাত কখনই

এমন গুরু হইতে পারে না, যে জন্য শুভার সত্য সত্যই বাঁশির মত নাকটি জন্মের মত বিকৃত হইয়া যাইবে। তথাপি সে পিসির সঙ্গলাভে উৎসুক তাহার কন্যাকে আবার কোলে উঠাইয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু হয়ত এখনি আবার আসবে। তাঁর না আসা পর্য্যন্ত যেন উঠিস্‌নি।"

শুভা উত্তর না করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু শুইয়াও সে একটু অস্থিরতার ভাব দেখাইল।

"তোর কি যন্ত্রণা হচ্ছে শুভা?"

"মুখ না ফিরাইয়াই শুভা উত্তর করিল—"না।"

"তবে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিস্‌ কেন?"

পুঁটি এই সময় বলিয়া উঠিল—"আমি পিসির কাছে শোব।"

"না তোর পিসির অসুখ করেছে।—তবে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিস্‌ কেন শুভা?"

মুখ ফিরাইয়া শুভা বলিল—"ওকে আমার কাছে দাও বৌদি!"

"আগে বল্‌, নইলে দেবো না।"

শুভা কিছু বলিল না, বালিশে মুখ ঢাকিয়া চোখ মুদিল। পরক্ষণেই আবার চোখ মেলিয়া মুখটা তুলিয়া বৌদি'র মুখের পানে চাহিল।

"তোর কি গরম বোধ হচ্ছে—বাতাস করব?"

"না।"

"তবে কি হচ্ছে খুলে বল্‌।"

"বৌদি,' দাদা আমাকে বক্‌বেন।"

"বাইরে গিছলি বলে? ভয় নেই, তোকে বক্‌তে দেব কেন—বক্‌তে হয় আমাকে বক্‌বে।" বলিয়া নির্ম্মলা শুভার মুখের দিকে আর না চাহিয়া একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই ঝড়ের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যৈষ্ঠ আবার তাহার প্রভাব বিস্তারের সূচনা করিয়াছে।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া শুভা নির্ম্মলাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—"হাঁ বৌদি!"—

"কি?—বৌদি ব'লেই চুপ করলি কেন? কি বলতে যাচ্ছিলি? বেশ, চুপ করেই থাক্‌, ডাক্তার আজ তোকে কথা কইতেও নিষেধ-ক'রে গেছে।"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে"—শুভা আবার চুপ করিল।

"বল্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, একেবারে বলে শেষ করে নে!"

তবুও শুভাকে নীরব দেখিয়া নির্ম্মলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"মন খুলে বল্‌। আমাকে বল্‌তে তোর লজ্জা কি? তুই যে আমার ননদ রে!"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে আর পুজো করতে দেবেন না?"

"এই কথা বল্‌তে সাতটা ঢোক গিললি! আমি মনে করেছিলুম না জানি কি সুভদ্রা হরণেরই পালা বলবি।"

এ কথার গভীর অর্থ শুভা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিবে না তা নির্ম্মলাও জানিত। তবে শুভা ননদ হইলেও সে ত-তাকে কন্যা পুঁটু রাণীরই মতন দেখিয়া থাকে। একটু চুপ করিয়া সে শুভাকে জিজ্ঞাসা করিল "একথা তোকে বললে কে?"

"মধু ঠাকুর যে পুজো করে গেল বৌদি!"

"সেই ত আগে পুজো করত। পুরুত মশাই দু'দিন এসেছেন বইত নয়।"

"দাদা যে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"দাদা ছাড়ালে কি হবে, বামুনঠাকুরের পুজো তোর মার পছন্দ হয় না। মধুঠাকুর বিড় বিড় করে যা তা মন্তর বলে ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপায়, তাই তার ভাল লাগে।"

"মায়ের বুদ্ধি নেই বৌদি।"

"পুরুত মশাই কি তোকে কিছু বলেছে?—বল্‌।"

"বলছিলেন।"

"এর মধ্যে কখন তোকে তিনি বললেন!"

"সরিকে ডাকছিলেন। সরি ছিল না, মা ছিল না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। তার পিপাসা পেয়েছিল।"

"কি বললেন?"

"বললেন, কলকেতা ছেড়ে চললুম শুভা দিদি! আর বোধ হয় এ দেশে আসব না। আমি বললুম, কেন যাবেন? বললেন, কাজ কর্ম্ম কিছু রইল না, এখানে থেকে খাব কি?"

"তুই তাতে কি উত্তর দিলি?"

"আমি বললুম বৌদি'কে আমি বলব।"

"যাতে তোমাকে আর কলকেতা ছেড়ে না যেতে হয়, তার ব্যবস্থা কর্‌তে?"

শুভা হাসিল। "আমি আর কিছু বলিনি বৌদি!"

"না বলেছিস্ ভালই করেছিস্। কিন্তু ঠাকুর দেশে গিয়েই বা খাবে কি ?"

"কেন বৌদি ? দেশে কি পুরুত মশাইয়ের খাবার নেই।"

"থাকলে কলকেতায় চাকরি করতে আসবে কেন ? দেশে এক মামী আছে, সে ঠাকুরকে খেতে দেয় না।"

"আর কেউ নেই বৌদি ?"

এ 'আর কেউ' এর অর্থ নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে হাসিয়া বলিল—"পুরুত ঠাকুরের বউ আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিস ?"

শুভা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণেক উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলা বলিল—"না শুভা, পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই।"

"দাদা তাঁকে কি জন্য ছাড়িয়ে দিলেন বৌদি !"

"এ বলা বড় শক্ত কথা শুভা, তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিস্।"

রাখু ঠাকুরের উপর শুভার অহেতুক মমতা দেখিয়া নির্ম্মলা মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল। তবে সে বালিকা, আর নির্ম্মলা তার এই ছোট ননদিনীটিকে চিরকাল কন্যারই মত দেখিয়া আসিতেছে আজিও পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে রহস্যের কথা কয় নাই। আর অধিক বলা উচিত নয় বুঝিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নে ঘুমো, এর পর আর কারও সঙ্গে কথা কস্‌নি। দেখি তোর পুরুত মশায়ের কলকেতায় রাখবার কোনও উপায় করতে পারা যায় কি না।"

"আমার গরম করছে না বৌদি !"

"তাহলে আমি যাব ?"

"পুঁটিকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি একলা থাকতে পারি না।"

"আবার উঠবি না ত ?"

"না।"

পুঁটিকে বিছানায় রাখিয়া, পাখাখানা শুভার হাতে দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া একটু রহস্যের ছলে নির্ম্মলা বলিল—"শুয়ে পড়ে পুরুত মশায়ের ভাবনায় ছট্ ফট্ করবি নাত ?"

"যাও" বলিয়া শুভা পুঁটিকে কোলে জড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

বারান্দার যে স্থানটিতে সে শ্বাশুড়ীকে বসিতে দেখিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া

নির্ম্মলা দেখিল সেখানে কেহ নাই। তাহার আর অনুসন্ধান না করিয়া সে কাপড় কাচিতে চলিল।

কলতলার নিকটে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল, "দিদি কেলো ?" একটু চিন্তান্বিতার মত বাড়ীর কোনও স্থানে কিছু লক্ষ্য না করিয়াই সে চলিয়াছিল। কথাটা শুনিতেই সে তন্দ্রা ভাঙার মত চমকিয়া উঠিল। সে কথা কাহাকে উপলক্ষ করিয়া কে বলিতেছে তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকাল হইতে এই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত রাখুর প্রতি তাহার ব্যবহার সমস্ত স্মরণ করিয়া সে বুঝিল, কাজটা তার অনেকটা বোকারই মত হইয়াছে।

পাছে শ্বাশুড়ী কিম্বা সরি তাহাকে দেখিতে পায় তাহাদের অলক্ষ্যে সে অনেক দূর সরিয়া আসিল। প্রথমে তার শ্বাশুড়ীর উপর রাগ হইল। এতক্ষণ তার সকল কথাতেই সায় দিয়া তবেত শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যখন সে মনে মনে নিজের কাজগুলার সমালোচনা করিল তখন নিজেকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দোষী করিতে পারিল না। শুভার উপর মমতা মায়ের অপেক্ষা বেশী দেখিয়া তার শ্বাশুড়ী যদি তার কাজগুলা অন্যভাবে দেখিয়া থাকে তা হইলে তাহাকে দোষী দেখিতে নির্ম্মলার অধিকার কি ?

মনে মনে নির্ম্মলা বলিল—"আমি এ বাড়ীর বউ বইত নয়, ননদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা দেখিতে আমার এত ব্যাকুল হওয়া, কাজটা একেবারেই অন্যায় হইয়াছে। তার মা আছে, ভাই আছে। উপর পড়া হইয়া শুভার কল্যাণ আমাকেই বা দেখিতে হইবে কেন ? দেখিলে কল্যাণই যে হইবে একথাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে ? যদি ফল বিপরীত হয় ?"

এক মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলার মনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কোনও অপ্রীতিকর কথা পাছে শুনিতে পায়, তাই সন্তর্পণে দূরে সরিয়া গেল। আসিয়া দাঁড়াইল যেখানে, সেখানে উপস্থিত দেখিলে তার শ্বাশুড়ী কিম্বা সরির মনে কোনও সংশয় জাগিবে না।

সেখান হইতে যে ঘরে রাখু আছে, অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় তথাপি নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কের মত, সেদিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল কারা যেন সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া কি যেন লুকাইয়া দেখিতেছে।

তাহাদের কার্য্যটি দূর হইতে নির্ম্মলা ভালরূপ বুঝিতে পারিল। বুঝিবার জন্য আর একটু চলিতেই বুঝিতে পারিল পাড়া সম্পর্কের খুড়ী শ্যামের মা ও দুই জন প্রতিবেশিনী বাহির হইতে উঁকি দিয়া রাখু ঠাকুরকেই দেখিতেছে।

নির্ম্মলার ইচ্ছাকৃত কাসির শব্দেই তাহারা তার অস্তিত্ব বুঝিল, একটু অপ্রতিভের মত নিকটে আসিল।

"কি দেখছিলে খুড়ী মা ?"

প্রশ্ন অনুচ্চস্বরে, উত্তর ও হইল সেইরূপ অনুচ্চস্বরে "শুভার কেমন বর হবে এদের দেখাচ্ছিলুম !"

দ্বিতীয়া বলিল—"দেখতে ত দিব্যটি !"

তৃতীয়া বলিল—"বয়স বেশি নয়।"

শুনিবা মাত্রই নির্ম্মলা বুঝিল, সরির দোষেই হ'ক কি শ্বাশুড়ীরই দোষেই হ'ক, রাখু সংক্রান্ত কথা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, শুধু এই বিবাহের কথা নয় হয়ত আরও অনেক। মনের গতির সঙ্গে নির্ম্মলার কথার গতি, কার্য্যের গতি সব ফিরিয়া গেল।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"বয়সও বেশি নয়, দেখতেও দিব্যি, প্রকৃতিটিও যতদিন ধ'রে দেখছি ভাল বলেই বোধ হচ্ছে— ছেলেটি আমাদের ঘরও বটে, কিন্তু হ'লে হবে কি খুড়ীমা, কিছু নেই। সামান্ত পুজারিগিরি চাকরি, লেখা পড়াও বিশেষ কিছু জানে না—অমন পাত্রকে ভগিনী দিতে কি বাবুর সাহস হবে !"

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া প্রথমার পানে চাহিয়া নির্ম্মলাকে বলিল— "আমিও তাই ভাবছিলাম মা, শুধু দেখতে সুন্দর হ'লে কি হবে, ঘর নেই, দোর নেই, কোন দেশে বাড়ী তার ঠিক নেই, এমন লোককে তোমাদের বাবু কি করে ভগিনী দেবেন।"

নির্ম্মলা এবারে একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"তার উপর মায়ের সে একটিমাত্র মেয়ে, আর বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক সমস্তই ত তুমি জান খুড়ীমা, ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক, আমার পুঁটিকে দিলে তত দোষের হ'ত না।"

এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করিয়া খুড়ীমা আসে নাই। সে একটু অপ্রতিভের মত বলিল—"তবে যে শুনলুম ঠাকুরের অনেক টাকা হচ্ছে।" আরও কিছু তাহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া গুছাইয়া সে-গুলার সে উত্তর দিবে।

শ্যামের মা বলিতে লাগিল—"বাড়ী, ঘর, গহনা গাঁটি নগতে শুনলুম প্রায় লাখোটাকার সম্পত্তি।"

নির্ম্মলার উত্তর শুনিবার জন্য শ্যামের মা'র দুজন সঙ্গিনীও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি যখন জেনেছ খুড়ীমা, তখন তোমাকে গোপন করব কেন, আমিও তাই প্রথমে মনে করেছিলুম। মনে করে ঠাকুরকে আটকে রেখেছিলুম। ভাবলুম কুলীনের ছেলে ত বটে, টাকার মালিক হ'লে তাকে মেয়ে দিতে আপত্তি কি।"

"তার পর ?"

"কোথায় কি !"

"সব ভুয়ো ?"

"সব না হ'ক, প্রায় বটে।"

"সে মেয়েটা—"

"মরেছে তুমি বিশ্বাস কর ?"

তৃতীয়া একটু ব্যঙ্গভাবে প্রথমাকে শুনাইয়া বলিল—"এই ! শুনলে মেজো গিন্নী ?"

নির্ম্মলা বলিল—"আর সে আবাগী মলেই বা ঠাকুরের কি।"

শ্যামের মা একটু হতাশের ভাবে বলিল—"শুনলুম—"

"তোমাকে শুনতে হবে কেন খুড়ী মা, আমি বলছি। তুমি যা শুনেছ, আমিও তাই শুনেছিলুম। নষ্টদুষ্ট মেয়েদের কথা—তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ—তোমাকে কি বলব। আর বললেই কি তুমি বুঝবে ?"

"সে মাগি তাহ'লে—"

"ও ঠাকুরের কেউ নয় কি কেউ এত হঠাৎ জানবার উপায় নেই।"

দ্বিতীয়া এইবারে মুখ খুলিল—"হ'লত শ্যামের মা, এইবারে চল।" বলিয়া সে নিজেই প্রস্থানোদ্যত হইল।

"তোমার নির্ব্বোধ ভাসুরপোকে ঠকাবার এও হয় ত একটা কৌশল।"

তৃতীয় দ্বিতীয়ার অনুসরণ করিল।

"আমিও ত তাই ভাবলুম, বৌমাকি আমার এতই নির্ব্বোধ হবে।"

তখন শ্যামের মা'র সঙ্গিনীদ্বয় অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা এই বারে অনুচ্চকণ্ঠে তাহাকে শুনাইয়া বলিল—"এইবারে তোমাকে বলি। এখন ও ঠিক কিছু বুঝতে পারিনি খুড়ীমা! সত্যি যে না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। খুব সম্ভব—সম্পর্ক মিছে মরা মিছে—সমস্তই নষ্ট মেয়ের ছলনা। তবু যদিই সত্যি হয় আর ঠাকুরের ধন পাওনা থাকে, তখন ঠাকুরের সঙ্গে শুভার বিয়ে দিলে কি দোষের হবে ?"

"কিছু না বৌমা, কিছুনা।"

মুহূর্ত্তের জন্য আর শ্যামের মা দাঁড়াইল না।

নির্ম্মলা ও তার চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া ঈষৎ দ্রুতপদে বরাবর উপরে একবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘর প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলাতি ধরণে সজ্জিত হইলেও, তার এক প্রান্তে একটি গঙ্গাজলের কলসী ছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মাথায় দিয়াই সে তাহার দেরাজ খুলিল। বাহির করিল তার ভিতর হইতে দুই তাড়া নোট ও এক মুঠ টাকা।

টাকা অঞ্চলে লইয়া, দেরাজ বন্ধ করিয়া, কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া বরাবর সে রাখুর ঘরে চলিয়া গেল।

রাখু তখন কলিকাটি মেঝেয় রাখিয়া হুকাটিকে দেয়ালে ঠেসিয়া রাখিতেছিল।

পিছন হইতে নির্ম্মলা বলিল—"আপনার ঘুম হয়েছিল দাদা?"

'একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

নির্ম্মলা এইবারে কি ভাবে কথাটা পাড়িবে ভাবিতে গেল। রাখুকে বিদায় দিবার কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"নালু কি আপনার কাছে ছিল না?"

"ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।"

"ছেলেটা কোথায় গেল। তাকে একটা কাজে পাঠাবার বিশেষ দরকার পড়েছে।"

বিশেষ কথাটায় একটু জোর দেওয়ায় রাখু একটু চিন্তিতের মত বলিল।

"তাকে খুঁজে আনবো কি?"

"সে কোথায় গেছে আপনি তাকে কেমন ক'রে খুঁজে পাবেন।"

"শুভাদির কি—"

"না, না দাদা, সে দিক দিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

"বাবু এসেছেন কি?'

"না, তিনি এখনও কইত এলেন না। কোনও খবর পর্য্যন্ত তাঁর পেলুম না। আজ আসবেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না।'

নির্ম্মলা এইবারে কথা পাড়িবার অবকাশ পাইল। রাখু ঠাকুর কথায় যখন কোনও কথা কহিল না, তখন আবার সে বলিল—'আপনার কথা শুয়ে শুয়ে একটু ভাবলুম দাদা—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল। নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"ভাবলুম। আপনার মনটা যখন বড়ই চঞ্চল হয়েছে—"

"বড়ই চঞ্চল দিদি।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"তুমি এই স্নেহ বন্ধনে না বাঁধলে এতক্ষণ উধাও হয়ে চলে যেতুম। এরকম বন্ধনের ভিতর থাকা কোনও কালে আমার অভ্যাস নেই।"

"না আপনাকে আটকে রাখা আমার এখন অন্যায় মনে হচ্ছে।"

"কলকেতার বাতাস আবার একবারেই সহ্য হচ্ছে না। তোমাকে গোপন করব কেন দিদি, এই তিন মাসেই এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।"

"দেশ থেকে একবার আসুন।"

রাখু আর উত্তর না দিয়া ছাতি হাতে করিল।

"কথা শেষ করতে না করতেই বুচ্‌কি হাতে করলেন যে!"

"বেলা বেলি হাওড়ায় চলে যাই।"

"দেশে গিয়ে কি করবেন?"

"প্রথম দু'চার দিন মামীর গাল খাব। তার পর যাত্রার দলে একটা চাকরি নেব। একটা পেট যেমন ক'রে হক চলে যাবে দিদি।"

"যাত্রার দলে কি করবেন?"

"আমি একটু বাজাতে জানি।"

"ছিছি, যাত্রার দলে আপনি ঢুকবেন কেন?"

"হীন কাজ বলে এতদিন ঢুকিনি, দু তিন জন যাত্রাদলের অধিকারী আমাকে সেধেছিল।"

"নানা তা করবেন না।"

"তবে কি করব—বিদ্যেও নেই, পয়সাও নেই। অকর্ম্মণ্য পরপ্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে সে কাজ কি ভাল নয়?"

"পয়সা কিছু হাতে হলে ব্যবসা করতে পারেন?"

রাখু আবার বিস্মিত নেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

নির্ম্মলা নোট ও টাকাগুলি রাখুর পায়ের কাছে ধরিয়া বলিল—"এইনিন্।"

"না না।"

"এদের টাকা নয় দাদা, তোমার ভগিনীর—মৃত্যুকালে আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

তথাপি রাখু হাত নামাইয়া টাকা তুলিতে পারিল না।"

"যদি না নাও—"

"নেবো দিদি—মাথাটা ঠিক রাখতে পারছি না।"

তার চক্ষু হতে জল ধারা পড়িতে লাগিল।

"নিয়ে যে ব্যবসা ভাল বুঝবেন করবেন।"

তথাপি রাখু দাঁড়াইয়া রহিল। আবেগ ঈষৎ দমিত করিয়া বলিল—"টাকা তুলে নাও। যতদিন আমি বাঁচব আমার ভগিনীপতির দোরে মাথা দিয়ে পড়ে থাকব দিদি!"

"মাথা দিলেত আর ভগ্নীপোতের কল্যাণ হবে না। যখন ইচ্ছা এরপর এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে আসবেন, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করবেন। টাকা তুলে নিন্। নালুকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনাবো মনে করেছিলুম। ওই টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।" বলিয়া নির্ম্মলা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল। তারপর দাঁড়াইয়া বলিল—"বরাবর দেশেই যাবেন?" "আর কোথাও যাবনা দিদি দেশেই যাব।"

"পুঁটি বুঝি কাঁদছে।"

"তুমি এসো" বলিয়া রাখু টাকা তুলিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বৈদিক, পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত।

সাধারণের যেরূপ ধারণা যে বৈদিক গাথাগুলি "এক আদিম জাতির গোচারণ সঙ্গীত" ("pastoral songs of a primitive people") বাস্তবিকপক্ষে তাহা নয়। ভাষার পরিণতির এবং ছন্দোবন্ধের জটিলতা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বৈদিক ভাষা কতখানি উন্নত হইয়াছিল। এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যেই বিভিন্ন উপভাষার (dialects) নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকগুলি উপভাষার মধ্যে একটি উপভাষা রাজনৈতিক কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার ভিত্তি স্থানীয় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কালে মধ্যবঙ্গের

ভাষার সহিত বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে চলিত ভাষার যে সম্বন্ধ এই ভাষারও কতকটা সেই ধরণের সম্বন্ধ ছিল।

বর্ত্তমান ভারতীয় চলিত আর্য্য ভাষাগুলি (Aryan Vernaculars of India) এই সকল বৈদিক উপভাষার একটি বা অপরটি হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণের ধারণা সংস্কৃত ভারতীয় বর্ত্তমান চলিত ভাষাগুলির মাতৃস্থানীয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই সকল ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য হেতুই এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। এই সকল সংস্কৃত শব্দ বহুদিন ধরিয়া ভাষার মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করিয়াছে এবং সংখ্যায় অনেক হইয়াছে। বিশেষত ব্রিটিশ জাতি এদেশে আসার পর যখন বর্ত্তমান গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের হাতে পড়িয়া বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা সংস্কৃতবহুল এক রকমের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়।

যে ভাষায় কালিদাস হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত কবিগণ লিখিয়াছেন সেই সংস্কৃত ভাষা (classical Sanskrit) কদাচ কথিত ভাষা ছিল না। শিক্ষিত পণ্ডিতলোকের ভাবের আদান প্রদানের উপায়স্বরূপ ইহা হয় তো প্রচলিত ছিল; এখন যেমন অনেক পণ্ডিত ইহাকে উক্তউদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল—কারণ বুদ্ধ লৌকিক ভাষায় নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের ভাষা যে সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন ছিল—তাহা তাঁহার নিজের কথা হইতেই বুঝা যায়, কেন না বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের কথা। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোকের সময় লৌকিকভাষা কত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহা অনুশাসন গুলি হইতেই দেখা যায়। অবশ্য পাণিনি যখন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করেন তখন সংস্কৃত কথিত ভাষা ছিল। কিন্তু পাণিনিকে আমরা স্যর আর, জি, ভাণ্ডারকরের মতানুসারে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ফেলিতে চাই (খৃঃ পূঃ ৮ম শতক)। এইস্থানে কথিত সংস্কৃত ভাষা বলিতে যাহা নির্দ্দেশ করা হইতেছে—সেটি বৈদিক ভাষারই একটি উপভাষা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কালক্রমে সংস্কৃত নামক কৃত্রিম ভাষা সৃষ্ট হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ভাষা যুগোপযোগী ভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই ভাষা হইতে অন্য কোন ভাষা জন্মগ্রহণ করে নাই।

বৈদিক ভাষার অনেক বিশেষত্ব পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান চলিত আর্য্য ভাষাগুলির ভিতর নিখুঁতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শব্দসম্পদ ও বাক্যবিন্যাসরীতি উভয়ের মধ্য হইতেই ইহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালি নামটি সম্বন্ধে একটু সাবধান হইতে হইবে। পালিও একপ্রকারের প্রাকৃত ভাষা--কেবল মাত্র ইহার পূর্ব্বতর আকার। কালক্রমে সংস্কৃতের ন্যায় পালিও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণগণের নিকট যেমন সংস্কৃত, বৌদ্ধগণের নিকট সেইরূপ পালি শাস্ত্র ও সাহিত্যের পবিত্র সাধু ভাষা হইয়া উঠে।

সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত ভাষাও কালক্রমে সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়। প্রাকৃত লোকমুখে নিজের ধারায় চলিতে থাকে। এই কথিত প্রাকৃতকে আমরা অপভ্রংশ বসিব। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই কথিত প্রাকৃত লোকমুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া কালে বর্ত্তমান ভারতীয় আর্য্য কথিত ভাষাগুলির আকার ধারণ করে। বৈয়াকরণিকদিগের তথাকথিত অপভ্রংশের কোনও নির্দ্দিষ্ট ধরণ নাই। সমস্ত সংজ্ঞা আলোচনা করিলে অপভ্রংশ বলিতে কি বুঝায় তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের বর্ত্তমান কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়াছেন। "অথ প্রাকৃতম্॥ প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।"—হেমচন্দ্র ৮, ১, ১,। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং মতং"—প্রাকৃত চন্দ্রিকা। "প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ"—প্রাকৃত সঞ্জীবনী। প্রকৃতি অর্থাৎ মূল সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া এই ভাষার নাম প্রাকৃত হইয়াছে।

রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের ভাষ্য মধ্যে কিন্তু নমিসাধু (১১২৫ বিক্রমাব্দ= ১০৬৯ খৃষ্টাব্দ) প্রাকৃতকে লৌকিকভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "সকল জগজ্জন্তুনাম্ ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বাগ্ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ, তত্রভবং, সৈব বা প্রাকৃতম্।" (Commentary on the Kavaylankara of Rudrata by Namisadhu, Edition Nirnaysagar Press, Bombay, 2.12) অর্থাৎ—"জগতের সাধারণ লোকের সহজভাষা ব্যাকরণের নিয়মে পরিশুদ্ধ নয় তাহাই প্রকৃতি; প্রকৃতি হইতে জাত কিম্বা প্রকৃতিই যাহার নানা স্বরূপ তাহাই প্রাকৃত।" (পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন ১৯২৭; পৃঃ ৩৫৫)

যে কোন দেশের "সাধু" ভাষা কতকটা কৃত্রিমতাপূর্ণ হইবেই; কেননা ইহার সাহায্যে লেখার মধ্য দিয়া ভাবের আদান প্রদান করা হয়। এই ভাষায় কেহ কথা বলে না। সকল কথিত উপভাষার সারাংশের উপর নানা কৃত্রিম আকার যোগ করিয়া এই ভাষা হয়। ইহাকেই "সাধু" ভাষা বলা হয়। তাহার অর্থ এমন নয় যে আমাদের কথিত ভাষা "অসাধু"। ইহার ভিতর কোনও নৈতিক উচ্চ-নীচতা (moral reproach) নাই, High German, Low German বলিতে high=উচ্চ, আর, low=নীচ এই দুই কথার ভিতর ভালমন্দের বিচার আসে না। কেবল নামকরণের সুবিধার জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে লজ্জা, ঘৃণা বা অশুদ্ধতার কোনও কথা নাই। "অসাধু" বলিয়া ভাষার জাতি যায় না।

আমাদের চলিত আর্য্যভাষাগুলির প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শনের এবং বৈদেশিক ভাষার মধ্যে একটী স্তর হারাইয়া যায়। এই হারানো ভাষা হইতে সেই সকল কথিত ভাষার উৎপত্তি যাহাদের লিখিত আকারে পালি প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই প্রত্যক্ষ নিদর্শনহীন ভাষাকে আমরা ভারতীয় মধ্যভাষা (middle Indian) বলিয়াছি। বৈদিক কথিত ভাষা হইতে আমরা এই মধ্যভাষায় আসি, তথা হইতে কথিত ভাষার ভিতর দিয়া অপভ্রংশে পৌঁছাই এবং এই অপভ্রংশ সমূহ হইতে বর্ত্তমানে চলিত আর্য্যভাষাগুলি পাই।

ভারতীয় চলিত আর্য্য ভাষাসমূহের বহির্গোষ্ঠী এবং অন্তর্গোষ্ঠী।

(The so-called outer-group and Inner-group of Indo-Aryan Vernaculars)

গ্রিয়ারসন সাহেব ভারতীয় চলিত আর্য্যভাষাগুলিকে কতকগুলি সাদৃশ্য হেতু এই উভয় ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিকযুগের পূর্ব্বে চরণশীল এক আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; তাহাদেরই কথিত ভাষা হইতে মারাঠী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষার জন্ম সম্ভাবনা হয় (derived from the patris of some pastoral Aryan tribes coming before the Vedic period)। এই সকল ভাষাকে গ্রিয়ারসন বহির্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী প্রভৃতি বৈদিক লিখিত ভাষা

যে উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই কথিত উপভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল ভাষাকে অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত করা হইয়াছে।

হুর্ণলে সাহেবের নিকট হইতে গ্রিয়ারসন সাহেব এই মতবাদের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষার ইতিহাস নামক ইংরাজী পুস্তকে গ্রিয়ারসনের এই অদ্ভূত মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ে ঃ—

(১) অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলিতে sibilants
শক্ত হয়

(২) বহির্গোষ্ঠীতে sibilants
নরম হয়

কারকবিষয়ে ঃ—

(১) অন্তর্গোষ্ঠীতে বিভক্তি দ্বারা কারক নিরূপণ না হইয়া স্বাধীন শব্দযোগে নিরূপিত হয়।

(২) বহির্গোষ্ঠীতে প্রথমে বিভক্তির প্রয়োগ পরে শব্দসংযোগে, তারপর সেই শব্দ রূপান্তরিত বিভক্তির মত কাজ করিতেছে।

ক্রিয়াবিষয়ে ঃ—

(১) প্রথমটিতে participle এর দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হয়।

(২) দ্বিতীয়টিতে কর্ম্মবাচ্যের দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হয়।

(১) অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাসমূহে 'ল' প্রত্যয় যোগে অতীতকাল নির্দ্দেশ হয় না।

(২) বহির্গোষ্ঠীতে past participle এর চিহ্ন 'ল' যোগে অতীত কাল নির্দ্দেশ হয়।

এই কল্পনাজাত মতবাদের কোনও ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এইরূপ সাদৃশ্য যে কোনও দুই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিতে পারে। বাংলা-ভাষার সহিত যেমন সুদূর ইতালির ইট্রাস্কান (Etruscan) ভাষার কিছু কিছু দৈবাৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এইরূপ সাম্যের উপর কোনও মতবাদ গঠন করা চলে না।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি গ্রিয়ারসন এখন এই মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ততটা জোর দেন না। এই সকল ভাষার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি অসাদৃশ্যও আছে—ইহার কোনও হেতু নির্দ্দেশ করা চলে না। হয়তো ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা প্রাকৃতিক কারণ কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা কোনও থিওরি দিয়া করা উচিত নয়, বিশেষ যে থিওরির ঐতিহাসিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক সুস্পষ্ট ভিত্তি নাই।

রুদ্র-আহ্বান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

এস রুদ্র এস হে ভয়াল
এস ভীম প্রভঞ্জন উড়াইয়া আধির জঞ্জাল
হুঙ্কারিয়া এস তুমি,
এই মর্ত্ত্য ভূমি
তোমার প্রবল দাপে থর থরি উঠুক কাঁপিয়া!
রয়েছে চাপিয়া
যে নিষ্ঠুর শিলাস্তূপ সংজ্ঞাহীন বুকে
তোমার সম্মুখে
মুহূর্ত্তে সরিয়া যাবে, পাষাণে উঠিবে জাগি প্রাণ
মরণের হ'বে অবসান!
ঘনঘোর মেঘ জালে ঢেকে ফেলে দিগ্‌ দিগন্তর
বিমুখ অন্তর
অকস্মাৎ অন্ধকারে কি যেন কি হারাইয়া ফেলি'
বাধাবন্ধ ঠেলি
অবহেলি মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন
শিরে রাখি বৃষ্টিধারা অবিরাম করকা বর্ষণ
আঁধার দুর্য্যোগ মাঝে সে এক দুর্জ্জয় অভিযানে
কোথা যাবে কিছু নাহি জানে!

বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানি' সচকিয়া মোহমুগ্ধ প্রাণ
কর তব অমোঘ সন্ধান,
জ্বালো জ্বালো প্রলয় আগুন
পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদগ্র সে ভীষণ দারুণ,
ছুটাইয়া দিকে দিকে
লেলিহান বহ্নিশিখা ; অন্ধ আজ চা'ক নির্নিমিখে,
আচম্বিতে
তোমার ভৈরব রব বধিরের কর্ণ হ'তে চিতে
উঠুক ধ্বনিয়া,
চলিবে রনিয়া
শিরা উপশিরা ব্যাপি' উষ্ণ রক্ত ধারা
আত্মহারা
আবেগে চঞ্চল,
নব জন্ম অনুরাগে শিহরিবে ধরার অঞ্চল !
ভূধর শিখর ভাঙ্গি এস তুমি ধ্বংশ অবতার
ভীষণ দুর্ব্বার
অনন্ত সাগর মাঝে তুমি ঢেউ পর্ব্বত-প্রমাণ
এস মহাপ্রাণ
আপনারে বিস্তারিয়া উৎসারিয়া লক্ষ কোটি স্রোতে
সংসারের বেলাভূমি হ'তে
ভাসাইয়া বিমলিন জরাজীর্ণ যত আবর্জ্জনা
করহে মার্জ্জনা—
কূল নাই, সীমা নাই, ভেসে যাও দৃষ্টিপরপারে
শুধু আপনারে
রেখে যাও ভগ্ন ধ্বংশ শেষ রেখাময়
অমর অক্ষয় !
নাচায়ে ধমনি
হে পিনাকি কর তূর্য্য ধ্বনি
মোহমুগ্ধ দুর্গদ্বারে পদাঘাতে বিচূর্ণিয়া আজ
এস মহারাজ

তোমার পরশ পেয়ে শৃঙ্খলের বজ্রগ্রন্থিগুলি
'উঠিবে আকুলি'
বন্ধন ব্যথায় রাঙা বিকশিত লক্ষ শতদলে ;
তব পদতলে
বন্দী মনে একান্ত নির্ভয়
তব মুখপানে চাহি' সমস্বরে গা'বে তব জয় !

"দেশেযাব কর্ত্তা"

[শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

দীননাথ রায়ের ছেলে রঘুনাথ রায় ডাক্তারী পাশ করিয়া যখন আর কোনও কিছু করিতে পারিল না তখন কিছু একটা করিবার জন্যই বোধ হয় আসামের এক চা বাগানে চাকরী লইল। আর বৎসরের পর বৎসর সেই একই বাগানে কাজ করিয়া নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইতে লাগিল—তাহার অর্থাগমের পরিমাণ আর স্বাস্থ্যের কুশল কিন্তু পল্লীবাসী পিতার নিকট একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

বৃদ্ধদীননাথ রায়ের অবশ্য আর্থিক অবস্থা একেবারেই খারাপ ছিল না এবং পুত্রের নিকট সাহায্য না পাইলেও পল্লীগ্রামে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইত তাহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ পুত্রের এই আচরণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার মর্ম্মে যে আঘাত দিত তাহাতেই তাঁহার গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যও সময়ে সময়ে সর্ব্বপ্রকার অশান্তিতে ভরিয়া উঠিত। সেদিন তিনি গৃহিণীর অশ্রু আর পুরাতন ভৃত্য রাঘবের খোকা বাবুকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুশোচনার কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিতেন না।

রঘুনাথ যেদিন চাকরী লইয়া দেশত্যাগ করিতে চাহিল সেদিন তাহার জননী অত্যন্ত আপত্তি করিলেও তাহার পিতা উন্নতিকামী পুত্রের ইচ্ছায় বিশেষ বাধা দিতে পারেন নাই। কারণ এই বিবাহিত পুত্র যে দৃষ্টির বাহিরে গিয়াই পিতা-মাতার সঙ্গেই তাহার বিবাহিতা পত্নীকে ভুলিয়া থাকিবে, অভ্যস্ত নহেন বলিয়া বোধ, হয় তিনি এতটা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কোন্ পিতা আশা করেন যে পুত্র দূরে গিয়াই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে।

কিন্তু পিতা যাহা আশা করেন নাই পুত্র যখন তাহাই করিয়া বসিল তখন তিনি শুধু নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, নিজের দূরদৃষ্টি হীনতার জন্যও যথেষ্ট অনুতপ্ত হইলেন। আর তাহাদের যাহাই হউক হতভাগিনী বধূটার জন্য তাহার দুঃখ ও বেদনার অন্ত রহিল না।

হায়রে নিজের সর্ব্ববিধ দীনতা ও হীনতার মধ্যে থাকিয়াও পুত্রকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া, মানুষ যদি তাহাকে হীন ও বিদ্রোহী ভাবিতেই পারিত, তাহা হইলে পুত্রের হস্তে পিতার নির্য্যাতন বারংবার ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না। আর বৃদ্ধ দীননাথ রায়ও পুত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার আচরণে ব্যথিত হইতেন না।

কিন্তু পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবার সময় গৃহিণী যথেষ্ট আপত্তি করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই বরং রঘুনাথের গমনকালে প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে তাহার সাহায্যই করিয়াছিলেন—আর করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন—এমন কি সময়ে অসময়ে সেই হতভাগা মেয়েটার মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার কুণ্ঠার অবধি রহিত না।

কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও পুত্রবধূর কল্যাণের জন্যই। অদৃষ্ট যদি তাঁহার সমস্ত শুভচ্ছাকেই বিপথে টানিয়া লইয়া যায় এবং সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত পুত্রও যদি পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য একখানা পত্র দিয়াও না করে, তাহা হইলে মানুষের শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া তিনি কি করিতে পারেন, অথচ ইহার মধ্যে যতটুকু করিবার তাহা তিনি না করিলে, আর কেহই যে করিবার নাই—তাহাও তিনি সুস্পষ্টই দেখিতেছিলেন, আর চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন।

তাঁহার এই সমস্ত দুশ্চিন্তার অংশ লইত কেবল রাঘব। রাঘব তাঁহার ভৃত্য, সখা, মন্ত্রী; নীচ হইতে উচ্চ সকল কার্য্যই এই চাষার ছেলে অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে করিয়া আসিয়াছে। কারণ ত্রিশবৎসর কাল এই একই সংসারে কাজ করিয়া সংসারে সে এমন স্থান অধিকার করিয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে সরাইতে গেলে সংসারই সরিয়া যাইবে, তবু রাঘবকে স্থানভ্রষ্ট করা যাইবে না—এগৃহ, গৃহকর্ত্তার সঙ্গে রাঘবের এতই আয়ত্ত হইয়াছিল।

যৌবনে এই রাঘবের সঙ্গে দেখা। সে এক পরম দুর্য্যোগময়ী-রাত্রিতে গৃহকর্ত্তার পরম-দুর্দ্দিনে। দুর্দ্দিনে সাক্ষাৎ বলিয়া, বিপদের সহায় বলিয়া এই

রাঘবকে শুধু স্নেহই করিতেন না, চাষার ছেলে হইলেও এই রাঘবকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

সে একদিনকার অপরাহ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হইবার পূর্ব্বেই আকাশে যে ঝটিকা-বৃষ্টির সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছিল—তাহাই রুদ্র হইতে রুদ্রতর মূর্ত্তি লইয়া যখন ধরাতলে নামিয়া আসিল আর তাহাদের তাণ্ডবনর্ত্তনে, ঘর্ষণে, বর্ষণে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেবাসুরের সংগ্রাম বাধাইয়াই তুলিল কি শোকোন্মত্ত শূলীর সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্যটার পুনরভিনয় করিয়া মানুষকে চোখের উপর দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই দীননাথ রায়ের পীড়িতা জননী ভয়েই হউক কি ভাবনাতেই হউক ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। আর তাঁহার পুত্র সদ্য মাতৃহারা হইয়া সংসারকে শুধু অন্ধকারই দেখিতে লাগিলেন না এই ঝড় ও ঝঞ্ঝার রাত্রিতে মৃতা জননীর শবদেহ কিরূপে তীরস্থ করিবেন তাহাই ভাবিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার আদি অন্ত রহিল না। কারণ এই বিভীষিকাময়ী রাত্রিতে কেহ যে তাঁহার মাতার মৃতদেহ বহন করিতে চাহিবে না শুধু তাহা নয় কাহাকে বলাও সঙ্গত হইবে না, অথচ এই মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকা যে গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ সম্ভব হইবে তাহাও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, শুধু বিষাদে বিপদে শঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে ছিলেন।

কিন্তু বিপদেরও একাকী পথ চলিতে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় সেও সঙ্গী না লইয়া পথ চলে না—তাহাতে মানুষের বিপদ যতই অপার হউক এবং তাহার জীবনপথ যতই দুরতিক্রম্য হউক। নহিলে মৃতা জননীর শবদেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিতে ছিলেন না বলিয়া ভয়ে যিনি বিপদের সমুদ্র দেখিতে ছিলেন পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার পূর্ণগর্ভা স্ত্রীর প্রসব বেদনা ধরিয়াছে শুনিয়া তিনি বিপদের মহাসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবেন কেন? অন্ধকার রাত্রি—আকাশে অন্ধকার মেঘ—জীমূতমন্দ্রে ধরিণীকে বারংবার প্রকম্পিত করিতেছে—বিদ্যুৎ আকাশের বক্ষে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আকাশকেই মথিত করিতেছে কি ধরণীর অন্ধকারময়ী মূর্ত্তিকে উপহাস করিতেছে আর তাহারই মাঝখানে এক আত্মার স্বর্গে গমন আর এক আত্মার মর্ত্ত্যে অবতরণ এই নিরীহ ব্রাহ্মণের অন্তরে বাহিরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়াই বোধ হয় দীননাথ বাবু দীননাথকেই ডাকিতে লাগিলেন। কারণ মানুষ

তাঁহার ক্ষুদ্র দম্ভ লইয়া স্রষ্টার অস্তিত্বকে যতই উপেক্ষা করুক, জীবনে এমন দিন সবারই আসে, যে দিন মানবের সমস্ত বিজ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস দিয়া দেবতার অমোঘ বিক্রমকে আর কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না—তাহা সম্পদের দিনে যাহাই হউক বিপদে পড়িয়া দীননাথ বাবু ভুল করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এই সময়েই একবার বিদ্যুৎ বিকাশ হইলেই তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাঁহার উঠানের মাঝখানে একেবারে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে তিন চারিজন লোক দাঁড়াইয়া আছে—আর তাহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই একজন বলিয়া উঠিল "ভয় কি কর্ত্তা, আমরা তোমার মায়ের সৎকার কর্ব্ব।" বলিয়াই যে অগ্রসর হইয়া আসিল—সে রাঘব—রাঘব সেদিনকার এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু দলপতি।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক বিপদে পড়িয়া রাঘবও হাবুডুবু খাইয়াছিল—এমনই এক অন্ধকারময়ী রাত্রিতে মাতার মৃতদেহ কোলে করিয়া সেও মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল। আর সে দিন তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—আজিকার এই বিপন্ন ব্রাহ্মণ দীননাথ রায়। দীননাথবাবু স্বয়ং সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অনক্ষর চাষার ছেলে রাঘব ভোলে নাই। কারণ সে ভুলিলে যে দীননাথ বাবুর নাম স্মরণ করা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

কিন্তু সত্যকার আত্মনিবেদন যে ব্যর্থ হয় না. নহিলে মানুষ যাহাকে বিপদে সাহায্য করিলনা—এমন কি মানুষের :চরম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিল—তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল কি না এক দস্যু। এমন ঘোরান্ধকারময়ী রাত্রিতে রক্তপাতের সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিয়া সে আসিল এই :ব্রাহ্মণের কুটীরে বিপদে ত্রাণ করিতে আর মানুষ যাহারা—যাহারা রক্তপাত করিতে জানেনা এমন কি রক্ত দেখিলেও শ্রীহরি স্মরণ করিয়া স্থান ত্যাগ করে—তাহারা রহিল নিজেদের গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাইতে—তাহাদেরই মত একজন মানুষ যখন বিপদের কুলকিনারা দেখিতে পাইতেছিল না।

হায়রে! অন্ধমানুষ! তাহারা কি করিয়া বুঝিবে যে, তাহারা পরের বিপদকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেও অন্তর্যামী নিশ্চিন্ত নহেন। তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে যে তাঁহার সদাজাগ্রত চক্ষু সূচীভেদ্যতিমিরেও দৃষ্টিহীন

হয় না। নহিলে এই রাঘবও ত তাহাদেরই মত একদিন পুরা মানুষ ছিল—মানুষেরই মত সংসারীর ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া দিন যাপন করিত। সে যে আজ মানুষের হত্যাকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই মানুষের অত্যাচারেই।

মানুষ যেদিন তাহার আজীবন ধর্ম্মাশ্রিতা বিগতযৌবনা বিধবা জননীর নামে কলঙ্ক রটাইয়া দিল এবং এই অপবাদের মধ্যে মূল সত্য কিছু আছে কি না তাহার কোন তত্ত্ব না লইয়াই তাহাদের মাতা পুত্রকে একঘরে করিয়া দিল। আর সেই জননী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল তখন তাহার মৃতদেহটা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহিল না এমন কি যে হারু ঘোষালের সঙ্গে তাহার এই কলঙ্ক রটাইয়াছিল সে পর্য্যন্ত এই মৃতা রমণীর একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিতে রাজী হইল না, সে দিন মানুষের উপর তাহার ক্রোধও ঘৃণার বোধ হয় অন্ত ছিল না।

কিন্তু ক্রোধ বা ঘৃণা তাহার যতই হউক জননীর মৃত দেহ কোলে করিয়া সহায়সম্পত্তিহীন প্রাণীমাত্র পরিত্যক্ত একাকী রাঘব কি করিতে পারে তাই ক্রোধ তাহার যতই হইতেছিল সে ততই উষ্ণ অশ্রুতেই পরিণত হইতেছিল। কিন্তু এই সময়েই দীননাথ রায় তাহার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি এই দরিদ্রকে বিপন্ন দেখিয়া অনশ্চিত ভাবেই গিয়া মৃতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিলেন আর রাঘব প্রাণীমাত্রের সাহায্য না লইয়া জননীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া গভীর নিশীথে একাকী দাহ করিতে চলিয়া গেল।

কিন্তু দাহ করিয়া সে যখন প্রেতভূমি শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিল তখন সে সত্যই প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল. কারণ সেই দিন হইতে সে যে সংহার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই এই কয় বৎসরে তাহাকে প্রসিদ্ধ দস্যু সর্দ্দার করিয়া তুলিয়াছিল—কারণ ও অঞ্চলে তখন রাঘবের মত প্রসিদ্ধ শক্তিশালী দস্যু দলপতি আর ছিল না।

কিন্তু এই প্রসিদ্ধ দস্যু অসংখ্য নরহত্যা করিয়াও দীননাথ রায়ের সেই এক দিনকার উপকার বিস্মৃত হয় নাই তাই এই গ্রামে আজ ঢুকিয়াই সে যখন এই ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনিল, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না—দুই চারিজন অনুচর লইয়া একেবারে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অসঙ্কোচেই বলিল, "ভয় কি কর্ত্তা, আমরা তোমার মায়ের সৎকার করব।"

আর দীননাথ বাবু সেই ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতেও হাতে প্রায় আকাশের চাঁদ পাইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা কে বাবা কোথা থেকে এলে?"

"পরিচয়ে দরকার কি কর্ত্তা খরচের টাকা দিয়ে দাও আমরা লাস তুলে নিয়ে যাই দেরি কর্ত্তে পাচ্ছিনা।" বলিয়াই রাঘব তাহার একজন অনুচরকে জোগাড় করিবার হুকুম দিল—আর প্রতিবাসীরা আসিয়া এই ব্রাহ্মণের বিপদে দুটা মৌখিক সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মাতার চিরস্থায়ী স্বর্গ বাসের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই দেবদূতের মত রাঘব তাঁহার মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু মৃতদেহের সৎকার করিয়া রাঘব যখন ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এই ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিতে আসিল এবং দীননাথ বাবুর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিল তখন দীননাথ বাবু আনন্দে উৎসাহে, উপকারের ঋণ স্মরণে এই দস্যুকে আলিঙ্গন করিলেন আর সেই মুহূর্ত্তেই রাঘবের ভিতরকার পশু প্রবৃত্তি সহসা দেবত্বে পরিণত হইল। এই ব্রাহ্মণের আলিঙ্গনবদ্ধ বাহুর পবিত্র কেমন স্পর্শ সে সহ্য করিতে পারিল না—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দস্যুপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া দাসত্ব গ্রহণ করিল।

সেই দিন হইতে এই ব্রাহ্মণের গৃহতলে বসিয়া বৈষ্ণবনীতির যে শান্তিময় শিক্ষা সে পাইয়াছিল তাহাই এই ত্রিশবৎসর ব্যাপী সাধনার সমুদ্রগর্ভে প্রবাল-দ্বীপের মত তাহার ভিতর এক শান্তিপ্রিয় মানুষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে মানুষ বাহিরে অনক্ষর হইলেও অন্তরে এতই মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল যে সে দিন বোধ হয় আর গুরুশিষ্যে কোন প্রভেদই ছিল না।

এই রাঘব যেদিন হইতে দীননাথ বাবুর গৃহে চাকুরী লইল সেই দিন হইতেই সদ্য প্রসূত খোকা বাবুর পালনের ভার তাহার উপর পড়িয়াছিল। সে তাহার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া রঘুনাথকে মানুষ করিয়াছিল। তাই তাহাকে বিদেশে পাঠাইবার সময় রাঘবের আপত্তির অন্ত ছিল না। সে কতবার কর্ত্তাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিল "কর্ত্তা, অমন কাজটি কর্ব্বেন না এই ছেলেকে এখন ছেড়ে দিলে তা'কে ফিরিয়ে পাওয়া শক্ত হবে।" কিন্তু কর্ত্তা তখন সে কথা কিছুতেই শোনেন নাই এখন তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইতেছিলেন বটে কিন্তু পিতার দেহ ও মন লইয়া তিনি পুত্রের উন্নতির পথে কি করিয়া বাধা দিতে পারিতেন তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

অথচ এই ত্রিশবৎসর কাল সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা প্রভু-ভৃত্যে জীবনের যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাকে সন্ধ্যার প্রাক্কাল বলিলেও হয় কি নিশি প্রভাতের পূর্ব্বসূচনা বলিলেও হয়। তাই তাঁহাদের পরস্পরের দুঃখে সমবেদনা যতখানিই থাক্ দুঃখ দূর করিবার শক্তি কুলাইয়া

উঠিতেছিল না—অথচ সঙ্গিহীনতার দৌর্ব্বল্য প্রতি মুহূর্ত্তেই যে বেদনার স্মৃতি অন্তরে জাগাইয়া দিতেছিল—তাহাও আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

কিন্তু ঠিক এই ভাবে বৃথা কালক্ষেপ করিলে যে চলিবে না এমন কি খোকা বাবুকে আর ফিরাইয়া পাওয়াও শক্ত হইবে, তাহা বুঝিয়াই রাঘব এক দিন প্রস্তাব করিয়া বসিল যে, সে খোকা বাবুর সন্ধানে যাইবে এবং তাহাকে না ফিরাইয়া আর গৃহ প্রবেশ করিবে না, কর্ত্তা ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই এই প্রভুভক্ত ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না—কারণ সে মূর্খ মানুষ কোথায় গিয়া হয়ত' এমন বিপদে পড়িবে যে তাহাকে উদ্ধার করিতেই আবার তাঁহার নিজেরই প্রাণান্ত হইবে। এই রাঘব যদি ত্রিশবৎসর আগেকার রাঘব হইত তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে তাহাকে অসঙ্কোচে পাঠানো যাইতে পারিত কিন্তু ত্রিশবৎসর কাল ধরিয়া তিনি এই রাঘবকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন—আর ত্রিশবৎসর কাল তাহাকে এতই সহিষ্ণু শক্তিহীন করিয়া দিয়াছে যে, এখন তাহাকে কোন সাহসের কাজ করিতে বলা হিমাচলকে সমভূমি হইতে বলার মতই বাতুলতা।

কিন্তু এই সময়েই রঘুনাথ অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, আর রাঘব কাহারও কোন আপত্তি কর্ণে না তুলিয়াই লাঠী ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল—খোকা বাবুকে ফিরাইয়া আনিতে। যাইবার সময় সে খোকা বাবুর প্রার্থিত অর্থও লইতে ভুলিল না।

কিন্তু সে যখন খোকাবাবুর বাংলোর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। সুদূরপ্রসারী অনুচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের বক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চায়ের বাগান তাহাদের ঘন বিন্যস্ত ঘনশ্যাম বর্ণে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মাঝে মাঝে শুভ্র সরুপথ সেদিনকার মেঘান্তরিত রৌদ্রে সুন্দরীর কবরী ঘেরিয়া পুষ্পমালিকার মতই শোভাসম্পন্ন বোধ হইতেছিল; পাহাড়-পাহাড়-যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পর্ব্বতের ক্ষুদ্র বৃহৎ শৃঙ্গ অভ্রভেদী শির তুলিয়া যেন আকাশকেই ভয় দেখাতেইছিল কিম্বা মেঘকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত্রীর সঙ্গে উচ্চাকাশের নিবিড় সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছিল আর রাঘব সেই বিরাট বিশাল সুগম্ভীর সৌন্দর্য্যের অসামত্বে এতই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সে খোকাবাবুর বাংলো ছাড়িয়া যে বরাবর চলিয়া যাইতেছিল, তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। কিন্তু সহসা একটা ইতর শ্রেণীর যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল—সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে

পাইল যে অসংখ্য কুলী রমণীদের মধ্যে বসিয়া যে লোকটা পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিতেছে সে আর কেহই নহে তাহারই বহুযত্নে পালিত খোকাবাবু স্বয়ং।

রাঘবের বিস্ময় বোধ হয় সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সে যে কি বলিবে বা কি করিবে কিছুই ধারণা করিতে পারিল না—শুধু নির্ব্বাক হইয়া এই মদধুত্ত নরনারীদের পানে চাহিয়া রহিল। সে তখন বোধ হয় ভাবিতেছিল যে এই পুত্রের জন্যই তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদের মুখের অন্ন তৃপ্তি করিয়া খাইতে পারেন না, এই স্বামীর জন্যই তাহার ধর্ম্মপত্নী রাত্রে নিদ্রা যায় না আর এই নরপশুর জন্যই সে তাহার দেশভুঁই ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়াছে তাহার কল্পিত রোগশয্যায় শুশ্রূষা করিতে।

কিন্তু তাহার এই বিস্ময়স্তব্ধ ভাব দেখিয়াই বোধ হয় মাতালের দল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল আর তাহাদের সেই পৈশাচিক হাসির শব্দ পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেই রাঘবের আচ্ছন্ন বিবেক সহসা আত্মস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও সেই কুলীরমণীটা তাহার হাত ধরিয়া আছে দেখিয়া ক্রোধে সে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার ভিতরে আবার সেই ত্রিশবৎসর আগেকার দস্যুর প্রাণ জাগিয়া উঠিল। সে একটা ঝাপটা দিয়া সেই মেয়েটাকে ফেলিয়া দিয়া একেবারে রঘুনাথের সম্মুখে আসিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিল "রঘুনাথ"!

সে স্বর শুনিয়া শুধু রঘুনাথই নয় তাহার পার্শ্বস্থ অনেক রঘুনাথেরই লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল আর রঘুনাথ স্বয়ং এত অসম্ভাবিতরূপে রাঘবকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ও তাহার কণ্ঠের এই বজ্রস্বর শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে নিষ্পন্দ হইয়া গেল। কিন্তু এই সমস্ত রমণীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার পিতার ভৃত্য যে তাহাকে শাসন করিবে ইহা তাহার মোটেই সহ্য হইল না। সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলিল "রাঘব, তুমি আমার চাকর সে কথাটা মনে রেখ'। দেশ থেকে এসেছ বাড়ী যাও" বলিয়া বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আর রাঘব—তাহার সমস্ত স্পর্দ্ধা, ক্রোধ, রক্তবর্ণ আঁখি এক মুহূর্ত্তে মাথা নত করিল। হায়রে রাঘব আজ চাকর—চাকর মাত্র, যে চাকর প্রভুর সমস্ত অত্যাচার অবিচার নীরবে সহিয়া যাইবে, প্রভুর কোন আচরণেই দ্বিরুক্তি করিবে না, প্রভুর কার্য্যের সমালোচনা করিবে না কারণ একেবারে সে চাকর। ইহা যে সত্য তাহাতে আর সংশয় ছিল না কিন্তু হায়রে এযে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য—রাঘব ইচ্ছা করিয়াই তাহার স্বাধীন জীবন বিসর্জ্জন করিয়া এই সত্যকেই আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে—আজ তাহাতে আর বিরোধ চলে না। সে যে ত্রিশবৎসর ধরিয়া এই দাসত্বকেই আলিঙ্গন করিয়া আছে। এই ত্রিশবৎসরের মধ্যে একদিনও বুঝিতে পারে নাই যে এসংসারের সে চাকর মাত্র। এসংসারে সে স্নেহের, ভক্তির, শ্রদ্ধার, সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আর তাহার সেই স্নেহ প্রভুকে কোনদিন প্রভুত্ব করিতে দেয় নাই। নিজেকে কোনদিন ভৃত্যের হীনতা অনুভব করিতে দেয় নাই। এসংসারকে সে আত্মীয়জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিল আর এ সংসারও তাহাকে তাহার প্রতিদান দিয়াছিল। এমন কি যৌবনেই যখন তাহার স্ত্রী মারা যায় তখন দীননাথ বাবু তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাঘব এই খোকাবাবুকেই দেখিয়া বলিয়াছিল "আবার আমার বিয়ে কি কর্ত্তা, এই যে আমার সোণার সংসার এখানে রয়েছে, খোকাবাবুর বিয়ে দিন না—দিনকতক ছেলে বউ কাঁধে করে নেচে বেড়াই।" আর এতদিন পরে খোকাবাবুর মুখ হইতে যে কথাটা বাহির হইল তাহা শুধু তাহার স্বপ্নের অগোচরই ছিলনা সে কথাটা সেই একটী মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত চিত্তকে ছিঁড়িয়া দলিয়া পিশিয়া দিয়া গেল। দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া খোকাবাবুর অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া গেল।

রাঘবের মর্ম্মে আঘাতটা কিছু বেশী লাগিয়াছিল, সে দীননাথ বাবুর দেওয়া প্রত্যেক পয়সাটা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া রঘুনাথের হাতে দিয়া দিল আর নিজে নিতান্ত ভৃত্যের মত প্রভুপুত্রের আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রভুপুত্রের আশের পাশের অনুচরেরা যে তাহার মতপরিবর্ত্তন দেখিয়া আড়ালে হাসিতে লাগিল তাহাও সে বুঝিতে পারিল, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিলনা। নিজের দুঃখে বেদনায় ঔদাসীন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। কিন্তু দীননাথ বাবুকে সে অনেক ভরসা দিয়া অসিয়াছিল তাই খোকা বাবুর হালচাল একবার না দেখিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিল না।

রাঘবের আসিবার পর সপ্তাহমাত্র অতিক্রম করিয়াছে এমনই সময়ে একদিন অপরাহ্নে আকাশে অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ দেখা গেল। শরীরও মন অত্যন্ত অবসন্ন ছিল বলিয়া রাঘব সেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়াও বাড়ী ছাড়িয়া একটু দূরে একটা ঝোপের কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। খোকাবাবুর আচরণ তাহার মর্ম্মকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছিল বলিয়াই হউক কি তাহার অতীত জীবনের অবাধ স্বাধীনতা কিরূপ হীনদাস্যে পরিণত হইয়াছে তাহারই একটা সমালোচনা করিবার জন্যই হউক সে যখন সে স্থানটায় আসিয়া বসিল তখন সন্ধ্যা সবেমাত্র ধরণীতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। উপরে আকাশ

ভ্রুকুটী করিতেছিল, নিম্নে বায়ু প্রবল প্রবাহে তাহার অঙ্গে মুখে আসিয়া প্রহত হইতেছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃকপাত ছিল না, সে শুধু নিজের জীবনটাকে লইয়া তোলপাড় করিতেছিল। এমনই সময়ে সহসা সেই নিবিড় বনান্তরাল হইতে এক উত্তেজিত নারীকণ্ঠ কর্ণে প্রবেশ করিল ও সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষেরও পরুষকণ্ঠ তাহার উত্তর দিল বলিয়া মনে হইল। বায়ু মাতালের মত ছুটিয়া ছুটিয়া বৃক্ষপত্রে শাখার চূড়ায় প্রতিহত হইতেছিল—শব্দ শুনিলেও রাঘব তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না অথচ প্রকৃতির এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ কালে নিবিড় গহনে নরনারী পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহাও জানিবার আগ্রহ তাহার কম হইতেছিল না। শব্দ অনুসরণ করিয়া রাঘব প্রকাণ্ড এক শালবৃক্ষের পশ্চাতে দাঁড়াইতেই সে বিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে এক আসামী যুবতীর সহিত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে যিনি কথা কহিতেছেন তিনি আর কেহই নহেন তাহারই প্রভুপুত্র রঘুনাথবাবু।

রাঘবের বিস্ময় যতটাই হইয়া থাক্ এই নিবিড় গহনে মেঘও সন্ধ্যার সম্মিলিত অন্ধকারে রঘুনাথ এই যুবতীর সহিত কি কথা কহিতেছে আর তাহাতে এত উত্তেজনাই বা কেন তাহা জানিতে তাহার আগ্রহের অন্ত রহিল না। কিন্তু সে ইচ্ছা তাহার পূর্ণ হইবার আগেই রঘুনাথ অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল "আমার কাছে এখন টাকা নাই রুমেলা বিবি, আমি তোমায় কিছুই দিতে পার্ব্বনা, তুমি যা ইচ্ছা করগে।" বলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ঠিক এই সময়ে রুমেলা তাহার বক্ষোবাস হইতে এক প্রকাণ্ড ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল আর খোকা বাবু 'মার্লেরে' বলিতেই রাঘব তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে পড়িল—কিন্তু সে রুমেলার হাত ধরিবার আগেই সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা আসিয়া রাঘবের স্কন্ধে পড়িল আর রঘুনাথ রুমেলা বা রাঘব কাহাকেও ধরিবার আগেই রাঘব চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল—রুমেলাও পলাইল।

কিছু দূর তাহার অনুসরণ করিয়া রঘুনাথ যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাঘব তাহার ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিতপাত হইয়া সমস্ত স্থানটাই রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিকটে আসিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তাই ত কি করি রাঘব ?" "কি কর্বে খোকা বাবু? দেশে ফিরে যাও, এ মায়ার দেশ—এখানে আর থেক না তোমাকে যে বাঁচাতে পেরেছি এই যথেষ্ট" বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু

উঠিতে পারিল না—উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল—আর ক্ষতস্থান হইতে শোণিত ধারা প্রবলতর বেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই সে আবার বলিল "রাঘব তার ডাকাতের প্রাণ নিয়ে ম'র্ব্বে না খোকাবাবু— কিন্তু আজ তোমাকে এই আসামের জঙ্গলে রেখে গিয়ে তোমার বাপকে কি বলতুম বলত ?"

রঘুনাথ বলিল "বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি রাঘব ?"

কষ্টে হাসিয়া রাঘব উত্তর করিল "কষ্ট ? মেয়ে মানুষের ছুরীতে রাঘবের কষ্ট হয় না খোকাবাবু—তবে আজ বড় বুড়ো হ'য়েছি—এত বুড়ো আমি বোধ হয় হ'তাম না খোকা বাবু—শুধু তোমার বাপই আমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।" বলিয়া সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া বলিল "আমার হাতটা ধরত' খোকা বাবু!"

খোকাবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিতেই রাঘব খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অবলম্বন না পাইলে চলিতে পারিবে না বুঝিয়া পথপার্শ্ব হইতে একটা দণ্ড কুড়াইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

কিন্তু এই খানেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল না। বাড়ী যাইবার পথে রাঘব একটু বৃষ্টিতে ভিজিল, তাহার ক্ষতস্থানে বেশ ঠাণ্ডাও লাগিল। বাড়ী আসিয়া সে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিল—আর রাত্রি শেষে তাহার প্রবল জ্বর হইল এবং সেই সঙ্গে বিকারের লক্ষণ ও দেখা গেল। বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকিতে লাগিল "আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও খোকাবাবু—ঐ ঐ আবার মার্ত্তে আস্ছে— আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও আমি দেশে যাব খোকা বাবু।"

কিন্তু খোকা বাবু তাহাকে দেশে পাঠাইবেন কি ? রাঘবের এই মুমূর্ষু অবস্থায়—তাহাকে দেশে পাঠানো যেমন সম্ভবও ছিল না—নিজের এই হীনতার কথা পিতার কর্ণগোচর করিতে তাহার লজ্জা কুণ্ঠারও তেমনই অবধি ছিল না। এমন কি তাহার ত্রাণকর্ত্তার মৃত্যুর কামনাও যে ভৃত্যবৎসল প্রভুর মনের কোণেও উদয় হয় নাই এ কথাও নিঃসংশয় বলিতে পারা যায় না।

কিন্তু প্রভুর কামনা যাহাই হউক—রাঘবের একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা হইল—"দেশে যাব খোকাবাবু—আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও।"

একদিন রঘুনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল "দেশে যাবি—দেশে তোর কি আছে ?"

সেদিন রাঘবের জ্বরটা একটু কম ছিল—সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেশে

আমার কি নাই কর্ত্তা ! দেশে আমার শাগের ক্ষেত র'য়েছে—আমার পুকুর-ঘাট—আমার বড় গাছের তলা র'য়েছে, সেই গাছের তলায় শুয়ে আমি যে কতদিন ঘুমিয়ে পড়ি ? আমার কি নাই ? আর নাই বা থাকৃল—তবু সে যে আমার দেশ—কর্ত্তা—আমার নিজের দেশ—আমার আপনার দেশ" বলিতে বলিতে রাঘবের চক্ষে জল আসিল—সে পুনরায় বলিতে লাগিল "এখানকার এই পাহাড়ে ম'লে আমার যে গতি হবে না ছোট বাবু—আমার দেশে মর্ত্তে পার্লে আমি যে গঙ্গা পাব—স্বর্গ পাব।"

"কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো, তুমি যে পথেই স্বর্গ পাবে—তা ভেবে দেখেছ কি ?"

'পাই পাব, তুমি আমায় নিয়ে চল'ত ? তোমার সেখানে কি নাই বলত ? তোমার মা, বাপ—পরিবার দেশভূঁই সব র'য়েছে—আর তাদের সব ছেড়ে কি নিয়ে এখানে প'ড়ে আছ বল দিকি ?"

কিন্তু রঘুনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই বাটীর বাহির হইয়া গেল—আর একদিনকার মহাশক্তিশালী দস্যু তাহার আবেদন এমনই ভাবে উপেক্ষিত দেখিয়া অসহায় বালকের মত দুঃখ ভয়ের অভিসংঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবশেষে রাঘব একদিন রঘুনাথেরই এক বাঙ্গালী বন্ধুর অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া খোকাবাবুর নামে একপত্র লিখিয়া লইল তাহাতে লিখিয়া দিল "কর্ত্তা, আমি আর থাকৃব'না, ছোটবাবু ভাল আছেন তিনি আমাকে কিছুতেই দেশে যেতে দেবেনা, আমি দেশে না গেলে কিছুতেই বাঁচবনা' তুমি একবার কৃপা করে চরণ ধুলি দিও।"

কিন্তু কর্ত্তার চরণধুলি দিবার আগেই রাঘবের অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—বেচারীর এ যাত্রায় স্বর্গ প্রাপ্তির দাঁশা একেবারেই অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু সে যেখানে তাহার নিবেদন জানাইয়াছিল—সেখান হইতে তাহার নিরাশা হইবার কোন আশঙ্কাই ছিল না—তাই তাহার পত্র পাইয়াই দীননাথ বাবু বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—আর তিনি যখন আসিয়া রাঘবের শয্যাপার্শ্বে দাড়াইলেন তখন রাঘব একেবারে আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। কিন্তু দীননাথ বাবু যখন তাহার মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'য়েছে রাঘব ?" তখন সে যেন স্বপ্নোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল—উঠিয়াই সম্মুখে দীননাথ বাবুকে

দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি দেশে যাব' কর্ত্তা—দেশে যাব।" বলিয়াই আবার অচেতন হইয়া পড়িল।

দেশে আসা হইল বটে, কিন্তু রাঘব বাঁচিল না। পাহাড়ী মেয়ের ছুরিকার আঘাত তাহার স্কন্ধে যতটা ক্ষত করিয়াছিল—বাহিরের ঠাণ্ডা তাহাকে আর ও বিষাক্ত করিয়া তুলিল—জ্বর তাহার ছাড়িল না। দেশে আসিয়া ও সে ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ বকিতে লাগিল—'দেশে যাব' কর্ত্তা, দেশে যাব।'

তার পর একদিন সেই দেশেরই মাটীর উপর শুইয়া রাঘব তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে চলিয়া গেল। আর তাহারই কিছুদিন পরে রুমেলার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া রঘুনাথও দেশে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু সে হতভাগ্যের স্বদেশ প্রত্যাগমনে—তাহার মাতা পিতা এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারিলেন না। কারণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে যে মহৎ প্রাণ বলিদানের প্রয়োজন হইল—তাহার তুলনায় রঘুনাথের প্রত্যাবর্ত্তন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। সেই দিন হইতে দীননাথ বাবু পুত্রের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেই পারিতেন না—সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কর্ণে রাঘবের সেই করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইত "আমি দেশে যাব কর্ত্তা—দেশে যাব।"

বিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন।

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

অভাব ও আকাংক্ষা সকল দেশের মানুষেরই আছে। এদের পূরণের চেষ্টার নামই জীবন-যাত্রা। এই যাত্রায় অযোগ্য পিছিয়ে পড়ে ও বিনষ্ট হয়, যোগ্যতম অগ্রসর হয় ও উদ্বৃত্ত হয়। প্রকৃতি সেই জন্য সকলকে যোগ্যতম হবার প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণা দ্বারা উদ্বর্ত্তনের পথে গিয়ে মানুষ আপনার অভাব অনুভব করে এবং সেই অভাবই তার হৃদয়ে অধিকতর নূতন শক্তি সঞ্চয়ের আকাংক্ষা জাগিয়ে দেয়। সেই জন্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকৃতিজ তাদের পূরণের চেষ্টাও তেমনি স্বাভাবিক।

পরাধীন দেশে এই অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন-কর্ত্তারা দু ভাবে বিভক্ত করেন—প্রথম, বৈধ বা legitimate, দ্বিতীয়, তার বিপরীত অর্থাৎ অবৈধ বা illegitimate ; এই বিভাগ অবশ্য বিভাগকর্ত্তার স্বেচ্ছাকৃত, কোন সর্ব্ববাদি

সম্মত নিয়মের অনুবর্ত্তী নয়। বৈধ বা legitimateএর মূলে আছে বিধি বা lex। সেটা প্রাকৃতিক বিধি, lex, নয়, মানুষের কল্পিত। কিন্তু অভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক। সেই জন্য প্রাকৃতিক গুণের মানুষ-কল্পিত শ্রেণীবিভাগে যে মত-ভেদ থাকা সম্ভব তা এতেও আছে। শাসক যাকে দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত করেন, শাসিত তাকে প্রথম তালিকায় স্থান দিতে চান। এই নিয়ে যে বাদানুবাদ হয়, তা যতক্ষণ তর্ক সভার বাদানুবাদের মত কথার গণ্ডীর মধ্যে থাকে তত-ক্ষণ শাসকবর্গ তাতে বড় কর্ণপাত করেন না, কিন্তু কথার গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন তা কাযের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে তখনই শাসকবর্গ তার মধ্যে ভয়ের কারণ দেখেন।

অভাব ও আকাংক্ষার এই শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর একটা বিবাদহেতু আছে। সেটা হচ্ছে সময়। আমাদের যে আকাংক্ষাগুলি বৈধ বলে শাসন কর্ত্তারা স্বীকার করেন, তারও পরিপূরণ হয় না, শাসন কর্ত্তাদের মতে, সময় হয়নি বলে। আমরা বলি সময় হয়েছে। এখানেও সেই মতভেদ ও মতভেদজনিত বাদানুবাদ। এই বাদানুবাদ এখন কথার তারল্য ত্যাগ করে কাযের কাঠিন্যে পরিণত হবার উপক্রম হচ্ছে। এতে লোকের মন অশান্ত হয়েছে। তাই শাসকবর্গের শীর্ষস্থানীয়েরা ব্যবস্থাপক সভা, ভোজসভা প্রভৃতি সকল স্থান থেকেই বলছেন, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। তোমরা সহিষ্ণু হয়ে থাক। শান্তিময় বিবর্ত্তনই (peaceful evolution) তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। বিপজ্জনক আবর্ত্তন (dangerous revolution) তোমাদের আকাংক্ষা পূর্ণ করতে পারবে না।

এই উপদেশের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই এখন বিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে। বিবর্ত্তন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, এর একটা পদ্ধতি আছে, নিয়ম আছে। সেই নিয়ম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর পরমাণু থেকে বিশাল বিশ্ব ও বিশ্বমধ্যস্থ প্রাণিজগতের উন্নতি অবনতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই নিয়মেরই অন্তর্গত। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অর্থ কতক গুলির নির্ব্বাচন আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলির বিবর্জ্জন। বিবর্জ্জন না থাকলে নির্ব্বাচন নিরর্থক। আর নির্ব্বাচন ও বিবর্জ্জন একত্র থাকলেই বুঝতে হবে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সংঘর্ষ আছে সংগ্রাম আছে—এই নির্ব্বাচন—অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের মধ্যে ও চলেছে। যে যোগ্যতম সেই উদ্বৃত্ত হয়। অযোগ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শারীরিক বা মানসিক বা উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীন

শ্রেষ্ঠতা থাকলেই যে যোগ্যতম হয় তা নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে প্রতিকূল কারণগুলিকে অতিক্রম করতে যে সমর্থ, তাকেই সেই অবস্থার যোগ্যতম বলা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উত্তেজনাকে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে শক্তিসঞ্চয় হয়। একই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বহুকাল থাকলেই মানুষ সেই অবস্থার উপযোগী হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন আর তাকে উত্তেজনা দিতে পারে না। উত্তেজনার অভাবে আর তার নূতন শক্তির সঞ্চার হয় না। শক্তির অভাবে উৎকর্ষ হয় না, বরং অপকর্ষ হয়। এই অবস্থায় অন্য কোন অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা জাতি সেখানে ক্রমে সংঘর্ষ উপস্থিত করলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এবং জাতির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং শেষে বিনাশ ধ্রুব। ভূতত্ত্ববিদ্যা পৃথিবীর নিম্নস্তর থেকে এর অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। প্রত্নতত্ত্বও এর অনেক অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এই সকল প্রমাণ থেকে, প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে বলা যেতে পারে যে বিবর্ত্তন মানে অনবচ্ছেদ উন্নতি নয়। এতে সমান অবস্থায় অবস্থিতি, ক্রমে ক্রমে অবনতি ও ধ্বংসও ঘটে। Joseph Mc Cabe বলেন "there has been a good deal of evolution in nature from what we call higher to lower levels" (১)। তিনি উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন প্রাণীর উন্নতির পর অবনতি ও বিনাশের উল্লেখ করে বলেন "During millions of years they advance in organization, then the advance seems to be arrested or disturbed and finally they are annihilated. The popular idea of 'race decay' and 'dying convulsions' is not in accordance with the facts. They are killed by changes in the environments or the rise of better-adapted opponents, as were the giant reptiles and so many inferior races of men and families of animals being annihilated to-day. Their disappearances are in the complete accord with the theory of evolution, and indeed strongly confirm it." (২) মানব-সভ্যতার ইতিহাসও এই কথাই সপ্রমাণ করে। Joseph Mc Cabe বলেন—

(১) Principles of Evolution, page 54
(২) Do Do page 56

"The history of civilization has proceeded in entire accordance with the principles of biological evolution, A Species fitted to its environments has remained unchanged, a Species altering its environment, or experiencing a change in its environments, has tended to change or die out (১)

বিবর্ত্তনের নিয়ম এইরূপ ; এ প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ কৃত নিয়মের মত বিধি নিষেধ নাই। "কুর্য্যাৎ," "ন কুর্য্যাৎ" নাই। আছে ঘটনার ও অবস্থার বিকৃতি। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দ্দিষ্ট ঘটনায় অবস্থিত হলে মানুষ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি) একটা নির্দ্দিষ্ট রূপে কায করে এবং তার একটা নির্দ্দিষ্ট ফল হয়। আমরা তাকে ভাল বা মন্দ বলি, কিন্তু প্রকৃতির কাছে তা ভাল ও নয়, মন্দও নয়। এ নিয়মের অর্থ এও না যে এদ্বারা মানুষ নিশ্চয়ই উচ্চ স্তরে উঠবে। একই অবস্থায় সমভাবে বহুযুগ থাকতে পারে এবং থাকে—সেও এই নিয়মের অনুবর্ত্তিতা, ব্যতিক্রম নয়। সিংহলের বন্য বেদ্দা, তাসমানিয়ান, বুষমান, ফিউজিয়ান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আয়েতা প্রভৃতি জাতিরা বহুযুগ ধরে স্বতন্ত্রভাবে এক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আবার চীন দেশের লোক, প্রাচীন পারসিক এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে। মিশর, মেসোপোটেমিয়া, বাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশেও সভ্যতার আরম্ভ এই রূপ হয়। এই সকল দেশ থেকে ক্রমে পশ্চিমগামী হয়ে সভ্যতা সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, গ্রীক-দ্বীপপুঞ্জ, গ্রীক এবং রোমে প্রবেশ করে। প্রতিবেশী অসভ্য জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই এরা জীবন সংগ্রামে যোগ্যতা লাভ করেছিল এবং দেশ দেশান্তরে বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন-করতে অসমর্থ হয়েছিল। এই সাম্রাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টার মধ্যেও দেখা যায় সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। যুদ্ধ বিগ্রহেই রোম-সাম্রাজ্যের ভিত্তি, যুদ্ধ বিগ্রহেই এর পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। রোম-নাগরিকের উচ্চতম আকাংক্ষা যোদ্ধারূপে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করা। রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালীও সেই ব্যবস্থা করত যাতে নাগরিকের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তার পর যখন প্রত্যন্ত দেশের অধিবাসীরা প্রবল হয়ে উঠল তখন সাম্রাজ্য বৃদ্ধি আর তত সহজ থাকল না, জীবন সংগ্রাম কঠিন হল। যে প্রকৃতি

(১) Principles of Evolution. page ২০৷

এত দিন রোমানদেকে শ্রেষ্ঠত্বে নির্ব্বাচন করে আসছিলেন তিনি এখন সেই প্রত্যন্তবাসী অসভ্যদেকে নির্ব্বাচন করে রোমানদেকে বিবর্জ্জন করতে লাগলেন। রোমানরা বহুকাল বিজেতার সুখ ও বিলাস ভোগ করে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। এখন অসভ্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় তারা বিজিত হল, ক্রমে বিনষ্ট হল। এও সেই বিবর্ত্তনের অনুবর্ত্তিতা। আর সেই বিবর্ত্তনের অনুবর্ত্তী হয়েই বিজেতা অসভ্য জাতি রোমের ধ্বংশের উপর নূতন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলে। আংগ্লো স্যাকসন (Anglo Saxon) জাতীয়েরা তাদের স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশ যাত্রা আরম্ভ করলে। ক্রমে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া নিউ জীলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি নূতন নূতন দেশে স্বজাতির প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। অসভ্য দেশে সভ্য জাতির প্রতিষ্ঠার অর্থ অসভ্য দেশবাসীর বিনাশ। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জীলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা তখন অসভ্য। কাযেই এই সকল দেশের অধিবাসীরা সভ্যতর আংগ্লো স্যাকসন জাতির সংঘর্ষে ক্রমে ক্রমে জাতীয় অস্তিত্বই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হল। অষ্ট্রেলিয়াতে নবাগত সভ্যেরা অসভ্য আদিম অধিবাসীদেকে বনবাসী করে তাদের দেশ অধিকৃত করে নিয়ে পশুপালনক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করলেন। নিউ জীলাণ্ড দেশের আদিম অধিবাসীরা সংখ্যায় ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে—১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ এক লক্ষ, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হয় ৮০,০০০ আশী হাজার, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হয় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার (১)। যুদ্ধ বিগ্রহ করে যে এদেকে নিহত করে নির্বংশ করা হচ্ছে, তা নয়। Mr. F. W. Pennefather, Jouprinal of the Anthropological Institute—পত্রে বলেন যে এই লোকসংখ্যাহ্রাসের কারণ পানদোষ ব্যাধি, ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, শান্তি ও ধন-সম্পত্তি (drink disease, European clothing, peace and wealth). ঐ পত্রেই J. Bonwick অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের সম্বন্ধে বলেন "Only a few remnants of the powerful tribes linger on * * * All the Tasmanians are gone, and the Maoris will soon be following. The Pacific Islanders are departing childless. The Australian natives as surely are descending to the grave, Old races everywhere give place to the new", অর্থাৎ আদিম নিবাসীদের শক্তিশালী জাতির মধ্যে অতি অল্পই আর অবশিষ্ট আছে। তাসমানিয়ানরা

গিয়েছে, মেওরিরাও তাদের অনুগামী হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ নিবাসীরাও নির্বংশ হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার দেশীয় লোকেরা কবরস্থানে চলেছে। সর্ব্বত্র পুরাতন জাতি নূতনকে স্থান দিয়ে অপসৃত হচ্ছে। F. Galton বলেন এখন পৃথিবীতে অতি অল্প স্থান আছে যা সম্পূর্ণ বিদেশী বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত নয়।

উত্তর আমেরিকাতেও এই ব্যাপার। দু শ-বৎসরব্যাপী সংঘর্ষের ফলে সেখানকার আদিম নিবাসী সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে পরাভূত হয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ পরাভব যুদ্ধে নয়, অস্ত্র শস্ত্রে নিহত হওয়া নয়। এতে সভ্যতার নিরস্ত্র প্রভাব তার পক্ষে যুদ্ধের সশস্ত্র প্রভাবের সঙ্গে সমান ফলদায়ক হয়েছে। এইরূপে দেশ লোকশূন্য হওয়াতে ইউরোপীয়দের কৃষিবাণিজ্যের জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ধরে এনে পশুর মত ব্যবহার করা হল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই নিগ্রো দাসত্বমুক্ত হল তখন প্রবলের সঙ্গে দুর্ব্বলের—যোগ্যতরের সঙ্গে অযোগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর এক নূতন ভাবে দেখা গেল। দাসত্বমুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো আইনের চক্ষে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়ের সঙ্গে সমান হল, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সমান অধিকার পেল। এর পরে নিগ্রো শিক্ষিত হয়েছে, ধনীও হয়েছে কিন্তু শ্বেতাঙ্গের কাছে এখনও সে সকল বিষয়ে হীন হয়ে আছে। M. Laird Clowes বলেন দাসত্বের দিনে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের উপর যেমন প্রভুত্ব করত, এখনও তেমনি প্রভুত্ব করছে। রাষ্ট্রীয় বিধি তাকে যে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়েছে শ্বেতাঙ্গ তাও তাকে পরিচালন করতে দেয় না। কোন রাষ্ট্রীয় বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে শ্বেতাঙ্গ তাকে কোন কথাই বলতে দেয় না। যে সকল ষ্টেটে কৃষ্ণাঙ্গই সংখ্যায় অধিক সেখানকারও এই অবস্থা। কৃষ্ণাঙ্গকে এক পাশে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়, বলা হয় এসকল বিষয় শ্বেতাঙ্গসম্বন্ধীয় কৃষ্ণাঙ্গের এতে বলবার কিছু নাই। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ ভয়ে মরে যায়। (১) যে দেশের শাসন-প্রণালী প্রজাতান্ত্রিক, যে দেশে সভ্যতা ও স্বাধীনতা পূর্ণ লাভ করেছে বলে

(১) He (any impartial observer) finds, on the contrary, that the white man rules as supremely as he did in the days of slavery. The black man is permitted to have little or nothing to say upon the point, he is simply thrust on one side. At every political crisis the cry of the minority is "this is a white man's question", and the cry is generally uttered in such a tone as to effectually warn off the black man from medling with the matter—Black America by Laird Clowes, page 8

দেশবাসীরা গর্ব্ব করে, সেইদেশে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে এখনও এই বিরোধ! কৃষ্ণাঙ্গ বলতে যে প্রকৃতই তাকে কৃষ্ণবর্ণ হতে হবে তার কোন অর্থ নাই। শরীরে রক্তে চার আনা, দু আনা কি এক আনাও যদি নিগ্রো-রক্ত থাকে, তা হলেই শ্বেতাঙ্গ সমাজে তার আর স্থান নাই। এই এক রক্ত-দোষেই শ্বেতাঙ্গ সমাজ তার উপর খড়্গহস্ত। শ্বেতাঙ্গ মূর্খ, পাপাত্মা, দরিদ্র হলেও সমাজে তার প্রবেশাধিকার অবারিত, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হলেও তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই দুই সমাজের মধ্যে একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে সেই সীমা অতিক্রম করবে, সেই দণ্ডনীয়, নিগ্রো এ অপরাধ করলে তার দণ্ড নানাপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার যার শেষ প্রাণবধ পর্য্যন্ত হতে পারে। শ্বেতাঙ্গ এ অপরাধ করলে সমাজচ্যুতিই তার প্রধান দণ্ড (১)।

শতকরা ৯৯ জন শ্বেতাঙ্গের রাজনীতিক ধর্ম্ম এই যে যা হয় হক যা ঘটে ঘটুক শ্বেতাঙ্গ অবশ্যই কর্তৃত্ব করবে। শ্বেতাঙ্গের কর্তৃত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুল্ক, স্বদেশী শিল্পের রক্ষা, অবাধ বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই শাসিত হয়।

(১) To incur this condemnation, he (the black man) need not be by any means black. A quarter, an eith, nay, a sixteenth of African blood is sufficient to deprive him of all chances of Social equality with the white man. For the being with the hated taint there is positively no social mercy. A white man may be ignorant, vicious and poor. For him, inspite of all the door is even kept open. But the black or colored man, no matter what his personal merits may be, is ruthlessly shut out. The white absolutely declines to associate with him on equal terms. A line has been drawn, and he who from either side dares to cross, cruelty and violence chase him back again or kill him for his temerity. If he be the white, ostracism is the recognised penalty—Back America by Laird Clowes. page 87.

(১) Repert of the Registrar General of New Zealand on the condition of the country in 1889 Quoted in Nature 24 October 1889.

যে শ্বেতাঙ্গ এই নীতিতে শ্রদ্ধাবান্ নন তিনি বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিবহির্ভূত। যিনি এতে শ্রদ্ধাবান্ তিনি আদরণীয়, যিনি অশ্রদ্ধাবান্—তিনি হেয়, অস্পৃশ্য উন্মাদগ্রস্ত (১)

Benjamin Kidd তাঁর Social Evolution গ্রন্থে বলেন এই যে জাতিবিরোধ, দুর্ব্বলের পরাভব, হীনতরের পরাধীনতা ও ধ্বংস, এ কেবল যে প্রাচীন ইতিহাসের বৃত্তান্ত, তা নয় এ আজও আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘটছে—বিশেষতঃ আংগ্লো-স্যাক্সন সভ্যতার সীমার মধ্যে যে সভ্যতার আদর্শ স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী নিয়ে সেই সভ্য জাতিরা এত গর্ব্ব করেন (১)।

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যে সকল ভারতবাসী ও অন্য অন্য জাতি সেখানকার কৃষিক্ষেত্রে ও খনিতে পরিশ্রম করে সে দেশের সমৃদ্ধি সম্পাদন করেছে, তারা এখন দেশে স্থান পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে কর্ত্তৃত্ব

---

(১) The cardinal principle of the political creed of 99 percent of the Southern whites is that the white man must rule at all costs and at all hazards. In comparison with the principle every other article of political faith dwindles into ridiculous insignificance. White domination dwarfs tariff reforms, protection, free trade and the very pales of party. The white, who does not believe in it above all else, is regarded as a traitor and an out-caste. The race-question is, in the south, the sole question of burning interest. If you are sound on that question you are one of the elect, if you are unsound, you take your rank as a pariah or as a lunatic.—Black America. p. 15.

(১) All this, the conllct of races before referred to, the worsting of the weaker, nontheless effective ever when it is silent and painless, the subordination or else the slow extinction of the inferior, is not a page from the past or the distant, it is taking place today beneath our eyes in different parts of the world, and more particularly and characteristically within the pale of that vigorous Anglo-Saxon civilization of which we are so proud, and which to many of us is associated with all the most worthy ideals of liberty, religion and government that the race has evolved.—Social Evolution, page 5?.

করবেন, অন্য কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্‌তে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিধিব্যবস্থা করেছেন যে কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে নাগরিকের অধিকার (right of citizenship) পাবে না। আইনের চক্ষে কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে অনধিকার-প্রবেশী। একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হয়ে ভারতবর্ষবাসী সেখানে স্থান পাচ্ছে না। অথচ সাম্রাজ্যের অন্য সকল দেশের লোক অবাধে ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের ধন আহরণ করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, আছে কেবল যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন।

এই ত গেল অন্য দেশের বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ভারতবর্ষেও এর অন্যথা হয়নি। আর্য্যবিজয়ের ইতিহাসও এইরূপ। আর্য্যেরা শ্বেতাঙ্গ, কোন সুদূর উত্তর পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে আসেন এবং সুজলা নদীসেবিত উর্ব্বর ভূমিতে বাস করেন। এ দেশের যারা আদিম নিবাসী তাঁদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তাঁদেকে আর্য্যেরা বললেন দস্যু এবং ক্রমে ক্রমে তাঁদেকে যুদ্ধে পরাজিত করে, বশীভূত করে কতকগুলিকে করলেন দাস আর কতকগুলি দেশ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন! সমস্ত দেশ আর্য্যদের অধিকারে এল। তার পর আর্য্যেরা "বর্ণ"ভেদ করলেন, আদিমনিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ হলেন শূদ্র। দেশশাসনের জন্য যথারীতি বিধি ব্যবস্থা হল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন যাজন, প্রজারক্ষণ, যজ্ঞ, পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ভাল কাযগুলি থাকল শ্বেতাঙ্গ দ্বিজাতীয়ের জন্য আর কৃষ্ণাঙ্গ শূদ্রের জন্য ব্যবস্থা হল—

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া।

(মনু ১।১১)

অর্থাৎ রাগদ্বেষ না করে উচ্চ বর্ণের সেবা করা। বাসস্থান সম্বন্ধেও বিচারটা এইরূপই হয়েছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত—এই সকল দেশে দ্বিজাতীয়েরা প্রযত্ন করে সংশ্রয় কর্‌বেন, অর্থাৎ দেশবাসীদেকে উচ্ছেদ করে আধিপত্য কর্‌বেন। আর

শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্ষিতঃ।

শূদ্র যেখানে সেখানে বৃত্তিকর্ষিত হয়ে অর্থাৎ দাসত্ব করতে গিয়ে বাস করবে। দাসত্বের জন্যই যে তার সৃষ্টি সে কথাও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

(মনু ৮।৪১৩)

শূদ্র ক্রীত হ'ক আর অক্রীত হ'ক তাদ্বারা দাস্য করিয়ে নেবে, কারণ দাস্যের জন্যই ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রভু যদি তাকে ত্যাগ করেন তথাপি তার মুক্তি নাই—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্ বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎতস্য ক স্তস্মাৎ তদপোহতি॥

মনু ৮।৪১৪

দাসের নিজস্ব কিছু থাকতে পারে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে দাসের ধন আত্মসাৎ করতে পারেন।

—বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদন মাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎস্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥

(মনু ৮।৪১৭)

আজকাল দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফরিকায় শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি যে ব্যবহার করছেন, একে তারই বৈদিক অবস্থা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

এইরূপে আর্য্যেরা সকল বিষয়ে সুবিধা করে নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশে আধিপত্য করতে লাগলেন। আর্য্যেরা তখন নানা দলে, অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। এক এক গোষ্ঠী এক এক প্রদেশ অধিকার করে রাজত্ব করতে লাগলেন। গোষ্ঠীপতিরাই রাজা হলেন। আদিম নিবাসীরা সকল প্রদেশেই কতক বিতাড়িত হয়ে বনবাসী হল, কতক বিজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে দাস হল। এই রূপে আদিম নিবাসীদের সঙ্গে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকল না। প্রকৃতি এইরূপে তাঁদেকে নির্ব্বাচিত করে নিয়ে, নিজের ধনসম্পদের অধিকারী করে দিয়ে তাঁদেকে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী করলেন। তাঁরা কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করলেন। এই অনুকূল অবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের বংশবৃদ্ধিও যথেষ্ট হল। বংশবিস্তার হলেই রাজ্যবিস্তারের আবশ্যক হয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আর বিস্তারশীল লোকসংখ্যার সমাবেশ হয় না। এইরূপে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয় এবং এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় প্রকৃতি আবার যোগ্যতমকে নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব হয়। আর আর্য্যদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হয়ে যারা বনে পর্ব্বতে প্রস্থান করেছিল তাদের আর বিবর্ত্তন হল না। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেল

তারা কোল, ভিল, সাঁওতাল উরাও রূপে সেই অবস্থায়ই আছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন (peaceful evolution) এদেকে বনবাস ত্যাগ করে, গ্রাম-নগরের জীবন-সংগ্রামে আত্ম-প্রকাশ আরম্ভ করলে। আর্য্যেরা বহুযুগ একই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে উপস্থিত হ'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়-প্রতিযোগিতা-হীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ ও অধিবাসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিদেশে আপনার খ্যাতি বিস্তার করেছিল। বৈদেশিক বিদ্যার্থী, বৈদেশিক পরিব্রাজক, বৈদেশিক বণিক যেমন ভারতীয় সভ্যতার ফল সংগ্রহ করতে এদেশে এলেন তেমনি বৈদেশিক প্রবল দলপতিরাও সদল-বলে রাজ্য স্থাপন করতে ভারতবর্ষে এলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমানেরাই প্রধান।

অতীত কীর্ত্তি জাতীয় চরিত্রের সহায়ক। সেই জন্য বিজেতা জাতি বিজিত দেশে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেই দেশের অতীত কীর্ত্তি লোপ করবার চেষ্টা করে। মুসলমানবিজয়ের পর এদেশে সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। প্রাচীন মন্দিরাদি অনেক নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে কালের মন্দিরগুলিই পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যের ভাণ্ডার ছিল। সেই জন্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বহুমূল্য গ্রন্থাদিও নষ্ট হয়ে গেল। দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের কত গ্রন্থ যে এইরূপে নষ্ট হল তার গণনা নাই। মুসলমান বিজয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল বিজিত জাতির মধ্যে অতি উৎসাহের সহিত তাঁরা তাঁদের ধর্ম্ম প্রচার করতেন। আবশ্যক হলে তার জন্য বলপ্রয়োগ করতেও তারা কুণ্ঠিত হতেন না। আচারে, বিচারে, প্রজার সহিত ব্যবহারে, বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নে সর্ব্বত্রই এই উদ্দেশ্যের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার পক্ষে এর ফল বিষময় হল। মুসমানদের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই আর্য্য-নীতির বিপরীতগামী। কাযেই এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আর্য্য-সভ্যতার বিবর্ত্তনজনিত উন্নতি না হয়ে অবনতি হল। মুসলমানেরা তখন নূতন তেজে তেজস্বী, নূতন বলে বলীয়ান। তারা প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। লোকে বলতে লাগল "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কিন্তু এই প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও তাঁদের শাসন কার্য্যে আর্য্যদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায় না। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যেরা যেমন কৃষ্ণাঙ্গ আদিম নিবাসীর প্রতি বর্ণ ভেদের জন্য ঘৃণা প্রদর্শন করতেন, মুসলমানেরা তা করতেন না। কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি ঘৃণা শ্বেতাঙ্গেরই স্বভাবজ, মুসলমানেরা শ্বেতাঙ্গ নয় বলেই বোধ হয়

তাঁদের স্বভাবে এটার অভাব ছিল। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করলেই সকল বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের সমকক্ষ হতেন। মুরশিদ কুলী খাঁ, "কালা পাহাড়" প্রভৃতি হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হয়েছিলেন; হিন্দুদের মধ্যে আবার শূদ্রেরা, বিশেষতঃ "অস্পৃশ্যেরা" অনেকে এই জন্য মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে রাজার জাতির সঙ্গে সমতা লাভ করলে।

তার পর যত সময় যেতে লাগল মুসলমানেরা ক্রমে এদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী হয়ে উঠতে লাগলেন। বাহ্য উত্তেজনার নূতন কারণের অভাবে আভ্যন্তর শক্তিরও হ্রাস হতে লাগল। জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যে সতর্ক কর্ম্মিষ্ঠতার আবশ্যক, ভোগবিলাসপরায়ণতা তাকে তিরোহিত করে দিল। দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি, উত্তরে শিখশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল। ইউরোপ থেকে ইংরেজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও এই সময়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এদেশে আবির্ভূত হলেন। প্রকৃতি আবার নির্ব্বাচন কার্য্য আরম্ভ করলেন। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হল, অনেক জয় পরাজয় হল। এর মধ্যে যোগ্যতম বলে ইংরেজের উদ্বর্ত্তন হল। ইংরেজ মুসলমানের হাত থেকে রাজ্যভার নিলেন। তাঁরা মুসলমান আচার বিচার ও শাসন-পদ্ধতিই দেখলেন। ভারতবর্ষের আদিম আচার বিচার ও শাসন-পদ্ধতি আর্য্যেরাই বিনষ্ট করেছিলেন, আর্য্যদের আচার ব্যবহার মুসলমান প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ইংরেজ শাসন তার মূলে মারাত্মক আঘাত করলে। সকল দেশেই রাজা ও রাজ্য-স্থাপনের আগে সামাজিক আচার বিচার থাকে। সেই আচার বিচারই রাজার অনুমোদন ও সমর্থন পেয়ে বিধিব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ অবস্থা অনুসারে বিবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় আর্য্য আচারের মধ্যে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে বিধি ব্যবস্থা সকল রাজকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নয়। রাজার শাসন পরিষৎ ছিল, বিচার সভা ছিল কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ছিল না (১)। ব্যবস্থা

(১) শাসন সভা—

অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গ-পারগাঃ।
পঞ্চত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ পরাশর ৮।১৯
… … তেষাঞ্চৈব হ্যসম্ভবে।
স্ববৃত্তি পরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ পরাশর ৮।২১

বিচার সভা—

যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥ মনু ৮।১১
কর্ষক বণিক্ পশুপাল কুসীদিকারবঃ স্বে স্বে বর্গে।
গৌতমীয় গৃহ্যসূত্রম্ ১১।২১

প্রণীত হত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা। তার মধ্যে সজাতীয়ের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা যতই থাক, সে ব্যবস্থা রাজা প্রজা উভয়ের প্রতিই সমান প্রযুজ্য। যেখানে রাজা বা রাজনিযুক্ত ব্যবস্থাপক ব্যবস্থার প্রণেতা সেখানে রাজার বা রাজনিযুক্ত ব্যবস্থাপকের আদেশেই ব্যবস্থার খণ্ডন এবং পরিবর্ত্তন হয়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারেরা রাজাদেশে সংহিতা প্রণয়ন করেন নি। তাঁরা নিজের তপোবনে সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন. দেশের অবস্থা অনুসারে যখন পরিবর্ত্তন আবশ্যক হল তখন পরবর্ত্তী সংহিতাকারেরাও তাই করলেন। কুল্লুক ভট্ট, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি আধুনিক ভাষ্যকারেরাও তাই করেছেন। তার পর এই সকল সংহিতা ও ভাষ্য পণ্ডিত সমাজে আলোচিত হত। বাদ প্রতিবাদ, তর্ক বিতর্ক এসম্বন্ধে অনেক হত। তার পর অধিকাংশ পণ্ডিত সমাজ যাকে গ্রহণ করতেন তাই দেশের সকল সমাজে চলত। রাজাও তাই গ্রহণ করতেন। এইরূপে যে বিধিব্যবস্থা প্রণীত ও গৃহীত হত ব্যবহারে তার প্রয়োগ হত পঞ্চ সমিতির (পঞ্চায়ৎ) দ্বারা। এই পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার আর্য্যসভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষকের ভূম্যাধিকারিত্ব আর একটি বৈশিষ্ট্য! "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদার মাহুঃ শল্যবতো মৃগম্" (মনু ৯।৪৪) যে ব্যক্তি বন কেটে পতিত জমি উদ্ধার করেছে, জমি তারই। ইংরেজ শাসনের আরম্ভেই এই সকল উঠে গেল। ইংরেজ বণিক্ রূপে এদেশে এসেছিলেন। বাণিজ্যেই তাঁদের দক্ষতা, রাজকার্য্যে তাঁরা অনভিজ্ঞ, অথচ অবস্থাচক্রে রাজকার্য্য তাঁদের করতে হল। সুতরাং রাজ কার্য্যের মধ্যে তাঁদের বণিক্ সুলভ ব্যবসায়বুদ্ধিরই প্রাধান্য হল। তাঁরা প্রজার হিতের চেয়ে নিজের লাভের দিকেই দৃষ্টি রাখলেন বেশী। হিন্দুদের আচার ব্যবহার দেখলেন না, বিচার-প্রণালীর সংবাদই নিলেন না, পঞ্চায়তি প্রথার অস্তিত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল, ভূমি সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার কোন অনুসন্ধানই করলেন না। অথচ এই সকলই সমাজের স্থিতি ও উন্নতির মূল। ইংরেজ বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নের ভার নিজের হাতে নিলেন, রেগুলেশন চালালেন, বিচার কার্য্য নিজেই করতে লাগলেন, পঞ্চায়তি প্রথা উঠিয়ে দিলেন, জমির খাজনা—আদায়ের ঠিকা দিলেন, কৃষককে সেই ঠিকাদারের (revenue farmer) হাতে বিনা সর্ত্তে (unconditionally) সমর্পণ করে দিলেন। আর্য্যসভ্যতার মূল ছিন্ন হয়ে গেল। বিলিতী শিল্প বাণিজ্যের আমদানী হল, দেশী শিল্প বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় পরাভূত হতে লাগল। কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধির

আর কোন বিঘ্ন থাকল না। দেশের ধন বাণিজ্যের স্রোতে বিদেশে যেতে লাগল, দেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগল।

সম্পূর্ণ ব্যবসায় বুদ্ধিতে রাজ্য চলে না, রাজত্বও চলে না! কোম্পানীর রাজত্বে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটতে লাগল। ইংলণ্ডেশ্বরী কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। এইরূপে ভারত-শাসন-যন্ত্রের চালকের পরিবর্ত্তন হল, কিন্তু যন্ত্রের পরিবর্ত্তন হল না। এক সম্প্রদায় ইংরেজ ভারত-নাট্যশালা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, আর এক সম্প্রদায় ইংরেজ তাতে প্রবেশ করলেন। ভারতবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় অপর পক্ষ সেই ইংরেজই থাকলেন। অধিকন্তু তাঁদের রাজ্যের ভিত্তি এখন দৃঢ়তর, বলবীর্য্য প্রভূত-তর হল। ইংলণ্ডেশ্বরী ঘোষণা করলেন যে তাঁর ভারতরাজ্যে বর্ণবৈষম্য থাকবে না, জাতিবৈষম্য থাকবে না, তাঁর যোগ্যতার মাপ-কাঠীতে ইংরেজ ও ভারতবাসী সমান হলেই রাষ্ট্রীয় সকল কাযেই ভারতবাসীর প্রবেশ অবারিত হবে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের যে জাতীয় চরিত্রগত বিদ্বেষ আছে রাজকীয় ঘোষণা তাকে বিদূরিত করতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর হীনতা সামাজিকতায় এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থায় থেকে গেল। যে সকল হিন্দু আচারবিধিব্যবস্থা প্রণয়নপ্রণালী, পঞ্চায়তি বিচার প্রথা, কৃষকের ভূম্যাধিকারিত্ব প্রভৃতি উচ্ছিন্ন করে ছিলেন, তার আর পুনঃপ্রবর্ত্তন হল না। বিলিতি শিল্প বানিজ্যের সঙ্গে বিলিতি শিক্ষার আমদানী হল, অবাধ-বাণিজ্য নীতি বৈদেশিক ব্যবসায়কে শোষণ করতে লাগল, সৈনিক বলবৃদ্ধি করা হল, দেশের দারিদ্র্য মোচনের কোন ব্যবস্থা হল না।

ইংরেজ শাসনের দোষগুণ বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই রাজত্বের প্রধান গৌরবের বিষয় যে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, প্রজার শিক্ষা বিধান করা সে সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। ধন প্রাণ রক্ষা শাসন প্রণালীর চৌকীদারী ধর্ম্মমাত্র, কিন্তু এর চেয়েও শাসন কার্য্যের গুরুতর ও উচ্চতর ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্ম সাধনের উপর শাসনের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। সেই ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম যা প্রজার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বিধান করে। সেই উপায় সম্বন্ধে সে দিন বঙ্গেশ্বর বলেছেন—যে তা দু রকমের—এক রকম শান্তিময় বিবর্ত্তন (peaceful evolution) আর এক রকম বিপজ্জনক আবর্ত্তন (dangerous revolution) বিষয়টা তিনি যে ভাবে বলেছেন তাতে বোধ হয় যে তিনি ঐ

শব্দটা বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করেন নি বিবর্ত্তন-বৈজ্ঞানের মতে (Science of evolution) প্রথমেই বিবর্ত্তনের একটা বিষয় থাকা চাই, তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার উপর বিবর্ত্তনের গতি বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নির্ভর করে। বিবর্ত্তন-বিজ্ঞান বলে যে বিবর্ত্তনের নিয়ম কেবল এই নয় যে কোন বিষয় অনবচ্ছেদে অবিরামগতিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠবে বিবর্ত্তনের নিয়মে যেমন গতি ও বৃদ্ধি আছে তেমনি সমানাবস্থায় অবস্থিতি, ক্ষয় ও বিনাশও আছে। সেই জন্যই সমস্ত বিশ্বটা বিবর্ত্তনের নিয়মাধীন হলেও জড় জগতে ও প্রাণিজগতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্য্যন্ত সকল-অবস্থা-গত পদার্থ বিদ্যমান আছে। সকলেই উচ্চতম স্তরে উঠতে পারে নি। আণ্ডামান দ্বীপের অত্যন্ত অসভ্য আদিমনিবাসী থেকে আমেরিকার সভ্যতম মানুষ পর্য্যন্ত এখনও পৃথিবীতে বাস করছে। আবার প্রাণিজগতের কত উচ্চতর জীবের সঙ্গে কত উচ্চতর মানুষও নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছে। আর অসংখ্য ইতর প্রাণীও মানুষ আবহমান একই অবস্থায় জীবিত আছে। Joseph Mc. Cabe তাঁর Principles of Evolution গ্রন্থে বলেন "I have already said that evolution is not a law of 'progress" in the moral sense of the word, and also that the general fact of evolution is consistent with prolonged stagnation and even degeneration,in particular cases. * * * * *

It must, therefore, not be imagined that because there is a 'law of evolution' civilization is bound to advance from height to height. (১),

তার পর দেখতে হবে বিবর্ত্তনটা হবে কিসের? ভারতের প্রধান সম্পদ কৃষি। প্রাচীন আর্য্য বিধান অনুসারে জমি ছিল কৃষকের, নব্য ইংরেজ বিধান অনুসারে কৃষক জমির স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন (peaceful evolution) কি তাকে আবার তার জমিতে স্বত্বাধিকারবান্ করে দেবে? সে কালে বিবাদ-মীমাংসা, বিচার, স্থানীয় পূর্ত্তকার্য্য পঞ্চায়তের দ্বারা হত। এই পঞ্চায়তের দ্বারা স্থানীয় আত্মশাসন সকল পার্লামেন্টের বাজ স্বরূপ আর ভারতবর্ষের এইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা সমূলে উৎসন্ন হয়ে গিয়েছে। তার স্থানে সেই নামায় যে পদার্থ টাকে স্থাপন করা হয়েছে সেটা দেশজ নয়।

(১) Principles of Evolution, page 229.

বিলিতি county council এর কলম অথবা তার তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ। সরকারী যত্নবাহুল্যে জীবিত আছে কিন্তু দেশের মাটির রস পায় নি; লোকে আপন করে নিতে পারেনি। তার উপর তার শোচনীয় দারিদ্র্য সকল কর্ম্মেই তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। বিবর্ত্তনেরদ্বারা উন্নতি হবে কবে? সেই খাঁটি ভারতবর্ষীয় পঞ্চ সমিতির না এই নকল আত্মশাসনের? ভারতের শিল্পবাণিজ্য অসম প্রতিযোগিতায় পরাভূত হয়ে বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্যের দাস হয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন ত ভারতীয় আদি শিল্পবাণিজ্যের এই পরিণতি ঘটিয়েছে!

ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের ক্রমভঙ্গ হয় প্রথম মুসলমান দ্বারা, তার পর ইংরেজ দ্বারা। এই ক্রমভঙ্গের জন্য সে শিক্ষা আর বিকাশত হতে পেলে না। তার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়েছে, তার উচ্চতা যতই হক, বিস্তৃতি অতি সামান্য। উচ্চতাও বিলিতি শিক্ষার পাদদেশ পর্য্যন্ত। এখনও দেশের একশ জন লোকের মধ্যে সাত জনের বেশী লেখাপড়া জানে না। তার পর যারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষা পেয়েছে তারা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে দেশীয় সাহিত্যে সঞ্চিত ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজাতীয় ভাবে চিন্তায় ও কার্য্যে একটা নূতন আভিজাত্যের সৃষ্টি করে জনসাধারণ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। দেড় শ বছরের উপর অপেক্ষা করে শিক্ষা এই সিদ্ধি লাভ করেছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন আর কত দিন অপেক্ষা করতে বলে?

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যত অল্প বলা যায় ততই ভাল। দেশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রও নাই তার নীতিও নাই। তত্ত্বতঃ বা কার্য্যতঃ তার শিক্ষাও দেওয়া হয় না। অব্যবহারে দেশের লোকের সে মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন কি তাকে পুনর্জীবিত করতে পারবে?

স্বদেশরক্ষার জন্য ক্ষাত্র ধর্ম্মের অনুশীলন সকল দেশেই প্রথম স্থানীয় বলে গণ্য। ইংরেজ দ্রোনাচার্য্য শূদ্র ভারতবাসীকে সে শিক্ষার অনধিকারী মনে করেন। বিনষ্ট প্রাচীন সামরিক বৃত্তিও কি বিবর্ত্তনের ফলে পুনর্জ্জন্ম লাভ করবে?

যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারই করা যায় যে বিবর্ত্তন আমাদের এই সকল অভাব-পূরণ করে দেবে তা হলেও জিজ্ঞাসা করতে হয় তার জন্য আমাদের আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? বিবর্ত্তন-বিজ্ঞানের (Science of evolution) পণ্ডিতেরা ভূ-তত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্ব বিস্তার প্রমাণ দিয়ে আমাদেরকে

বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর বিবর্ত্তনের পথে ভ্রমণ করে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তার বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে। মানুষেরও এই বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হতে কত সহস্র বৎসর লেগেছে। তাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় শান্তিময় বিবর্ত্তনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হতে আমাদের কত দিন লাগবে?

এর উত্তরের জন্য উদাহরণ স্বরূপ দুটি দেশের কথা বিবেচনা করা যাক্। একটি আমেরিকার যুক্তরাজ্য, আর একটি আয়ারলাণ্ড। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ়। এই বিরাট সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতার যুদ্ধে। আর ভারতের মুসলমান-রাজত্বের পতন ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থানের আরম্ভ হয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙলা বিহার-ওড়িয্যার দেওয়ানী লাভে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই দুই ঘটনায়, কবির ভাষায়, মনে হয়——

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাম্
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু।

দুটি ঘটনাই প্রায় সমকালীন, কিন্তু কালের গতি দুই দেশে দুই বিপরীত ফল প্রসব করেছে। বৃটিশ-সাম্রাজ্য-নাট্যশালা থেকে আমেরিকার নিষ্ক্রমণ, ভারতের বন্দীভাবে তাতে প্রবেশ ও আজ পর্য্যন্ত সেই খানে সেই ভাবেই অবস্থিতি। সময় তার বিবর্ত্তন ঘটাতে পারে নি।

আয়ারলাণ্ড সাত শ বৎসর পরাধীন থেকে আজ বোধ হয় মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সাত শত বৎসর ব্যাপী অধীনতার অভিনয়ে আয়ারল্যাণ্ড কি কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শকের মত পটপরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় বসে ছিল? আয়ারলাণ্ড বৈধ আন্দোলন করেছে আর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাকে অবৈধ আন্দোলন বলেন, তাও করেছে। স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে, আইরিশ সাধারণ তান্ত্রিক সৈন্যদল গঠিত করেছে, রাজ সৈন্য এবং পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। রাজা তার স্বাধীনতার শক্তি সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তার অভীষ্ট বর দিচ্ছেন। ভারত এবিষয়ে অতুলনীয়, ভারতীয় আন্দোলন রক্তপাত বিহীন, উপদ্রবশূন্য, অহিংস এই বৈষ্ণবী সাধনায় কি রাজা প্রসন্ন হবেন না? অপর পক্ষ বলবেন এই দুটি দেশে—আমেরিকায় ও আয়ারলাণ্ডে—যা ঘটেছে তা বিবর্ত্তন নয়, আবর্ত্তন, Evolutlon নয়, Revolution; যদি তাই হয় তার ফলটা যে হয়েছে অন্য দেশের পক্ষে লোভনীয়। তাতে যে এক রকম স্বীকার করা হচ্ছে যে বিবর্ত্তনের চেয়ে আবর্ত্তন ভাল। কিন্তু বিবর্ত্তন বিজ্ঞান আবর্ত্তনের

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অন্য লোক যাকে আবর্ত্তন বলে, বিবর্ত্তনবাদী তাকেও বিবর্ত্তন বলেন। বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে আবর্ত্তন চলছে। মানুষ সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টি। প্রতি মুহূর্ত্তের আবর্ত্তন লক্ষ্য করে না। কিন্তু সেই আবর্ত্তনের ফল পুঞ্জীভূত হয়ে যখন একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং বলপূর্ব্বক মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, মানুষ তখন সেই অলক্ষিত মুহূর্ত্তগুলির সমষ্টিকে যুগান্তর বলে, আর যে বৃহৎ পরিবর্ত্তনটা ঘটে তাকে বলে আবর্ত্তন (revolution) মানব সভ্যতার সকল বিভাগেই এই আবর্ত্তন হয়। এইরূপে আমরা বলি শিক্ষার আবর্ত্তন (revolution in education) শিল্পের আবর্ত্তন (revolution in arts and manufacture), বাণিজ্যের আবর্ত্তন (revolution in trade and commerce) ইত্যাদি। তখন আবর্ত্তন শব্দটি দোষবাচক না হয়ে গুণবাচক হয়। কিন্তু শাসন প্রণালী সম্বন্ধে 'আবর্ত্তন' শব্দটি ব্যবহার করলে অর্থাৎ revolution in government বললেই আবর্ত্তনের অর্থ হয় বিদ্রোহ, revolution মানে হয় revolt ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তা নয়। বিবর্ত্তন তার স্বভাবিক অতি মন্থর গতি ত্যাগ করে ক্ষিপ্ত গতিতে উপস্থিত হলেই তার নাম হয় আবর্ত্তন।

ডালি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ

[টেরেন্স ম্যাক্‌সুউনি]

(১)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ আমাদের দেশের পূর্ণ পরিণতি লাভের একমাত্র উপায় এবং কেবল ইহাতেই ইংলণ্ডের সহিত আমাদের শান্তি স্থাপন হইতে পারে———এই বিষয় যখন আমরা আলোচনা করিতে অসগ্রস হই, তখন আমাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে নানা ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করি কিন্তু একটি ভাবের সম্পূর্ণ অভাব————এই প্রশ্নটি সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া যদি সম্ভব হয় ইহাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা। কেহ হয়ত এই প্রশ্ন উঠিলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িবেন, আর কেহ হয় ত ইহাকে ভাসা ভাসা আলোচনা করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া দার্শনিকসুলভ বিজ্ঞতার সহিত উড়াইয়া দিবেন। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় কেবল জনসাধারণের মতে মত দিয়াই চলেন, সুতরাং তাঁহাদের

জন্য নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। একদিন কোনও মহৎ কর্ম্মে বা কোনও মহান্ ত্যাগে জাতির প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে,এবং জনসাধারণ তাহাদের আলস্য ও কুসংস্কার হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইবে। আমরা সেই মুহূর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইব এবং আপনাদিগকে প্রস্তুত করিব। তারপর আমার দার্শনিক প্রতিপক্ষের কথা —আমার আশা আছে যে তিনি আমার যুক্তিগুলি শুনিবেন। আমার যখন বলা শেষ হইবে, তিনি হয়ত তখন আমার সহিত অনেক বিষয়ে একমত না হইতে পারেন, কোনও বিষয়ে হয় ত মতের ঐক্য না হইতে পারে, তথাপি যদি আমার যুক্তিগুলি শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি একটি কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে তিনি তখন স্বীকার করিবেন এ বিষয়টি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে।

(২)

আমাদের প্রতিপক্ষের মনোগত ভাব কতকটা এইরূপভাবে বুঝান যাইতে পারে এই বিচ্ছেদের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত ও বিচারসহ ইহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করি নাই। ইহাকে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াছি, ইহার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, ইহার সাধনোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও ইহাকে লাভ করিতে হইবে, কিন্তু জীবনের দর্শন শাস্ত্রে ইহার একটা বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করি নাই। আমাদের উহাকে প্রকৃত পক্ষে ও যথার্থরূপে দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। দর্শন ও বিজ্ঞানের ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ নীতি যে এই জগৎ একটি অখণ্ড সত্তা, এবং জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হইবে যাহাতে প্রমাণ হইবে এই বিশ্বের ধারা ও সত্তা অভিন্ন ও অখণ্ড। সুতরাং বিচ্ছেদপন্থীরূপে আমাদের দাবী যথার্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে আমাদের জাতীয় জীবন বিকশিত হইয়া একত্র গ্রথিত হইয়া পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবে, ইহাতে আমাদিগকে বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দিবে, এবং আমাদের জাতীয় ভাগ্যগঠন করিতে সহায়তা করিবে ; আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সকল সংগ্রামের মাঝে এই জাতীয় ভাগ্য তাহার সমস্ত মহত্ত্ব লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা যদি এ বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চাই, তাহা হইলে একথাটি আমাদিগকে মানিয়া

লইতেই হইবে। যে মহৎ নীতি আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছে, যাহা আমাদের জন্য একটা বাঁধা ধরা কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, যাহাতে আত্মোৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম, বহুবর্ষ ধরিয়া কষ্টসহিষ্ণুতা এবং হয় ত লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুকেও বরণ করা আবশ্যক হইবে, সেই মহৎ-নীতির সত্যতা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে এমন সব নিয়মের দ্বারা যাহা উহাকে যথার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে ইহার নিকট আমরা বশ্যতা স্বীকার করিব কেন? ইহাকে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিব সে পরীক্ষা কত আত্মোন্নতি সাধক ও গভীর ভাবদ্যোতক। ইহাতে আমাদিগকে কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কার বর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; তাহাতে যদি আমরা সম্মত না হই, তাহা হইলে আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু আমরা সম্মুখপথে অগ্রসর হইবার নির্ভীকতা লাভ করিব, এবং অবশেষে জয়ী হইব, কেবল এই কথা আমাদিগকে সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও স্বস্তি উপলব্ধি করা, সমস্ত পৃথিবীকে—ইহার একটু সীমাবদ্ধ স্থানবিশেষকে নয়——মানবের সুন্দরতর আবাসে পরিণত করা।

এই দিক হইতে প্রশ্নটির সমাধান করিতে চেষ্টা করিলে, ইহা সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট মহৎ ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া গণিত হইবে। আমাদের যে প্রতিপক্ষ পূর্ব্বে এ প্রশ্নটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এখন ইহার আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবেন। হয়ত এখনও তিনি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারেন, তিনি পতিত ভুমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তির সহিত উহার দৌর্ব্বল্য তুলনা করিয়া বলিতে পারেন— —"তোমার দর্শন অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা স্বপ্নমাত্র।" কিন্তু তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, ইহাই একটা মস্ত-লাভ; এইরূপে আমরা তাঁহাকে ক্রমশঃ একটু একটু অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করিব এবং অবশেষে আমরা যে নীতির জন্য সংগ্রাম করিতেছি, তিনিতাহাই গ্রহণ করিবেন।

(৩)

মানুষের কাজ করিবার পক্ষে এখন প্রধান বাধা সেই সাধারণ ভ্রান্তি যে মানুষের দেশের কাজ এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইবে যেন উহা তাহার

জীবদ্দশায়ই ফলপ্রদ হইতে পারে। ইহা কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত, কারণ মানুষের জীবন মাত্র কয়েক বর্ষব্যাপী, কিন্তু একটা জাতির জীবন বহু শতাব্দী ধরিয়া, এবং যে হেতু একটা জাতির কার্য্যপ্রণালী উহাকে ভবিষ্যতে পূর্ণ-বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই হেতু মানুষকে এমন একটা লক্ষ্য ধরিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে, যাহা কেবল ভবিষ্যৎ বংশে সফলতা লাভ করিতে পারে। মানুষ তাহার নিজের জীবনে কি প্রণালী ধরিয়া কার্য্য করে তাহাই দেখা যাউক। তাহার বাল্যকালও কৈশোর এমন ভাবে যাপিত হয় যাহাতে তাহার পূর্ণ বয়সের কাল ও যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশে পরিণত হইতে পারে, শরীর দৃঢ় সম্বদ্ধ, মন সুপ্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টি সূক্ষ্ম, উদ্দেশ্য মহান, আশা উচ্চ—এই সমস্তই কোনও বিশেষ কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। মানুষের শৈশব ও কৈশোর যেমন সুনিয়োজিত ও সুব্যয়িত হইবে, তাহার যৌবন সেইরূপ মহৎ হইবে। শৈশবে জমী প্রস্তুত হয় এবং পূর্ণ পরিণতির সময়ে চমৎকার ফলোৎপাদনের জন্য বীজ উপ্ত হয়। জাতির পক্ষেও ঠিক এইরূপ। আমরা জমী প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতে পূর্ণ পরিণত হইয়া ফলপ্রদ হইবার জন্য বীজ বপন করিয়া যাইব; মনে রাখিতে হইবে যে একটা জাতির পূর্ণবিকাশ এক পুরুষে হয় না, পুরুষপরম্পরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; এই জ্ঞান লইয়া আমাদের কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে আমরা যে এখন কার্য্য করিতেছি তাহার ফল ভবিষ্যতে আমাদের অনেক পুরুষ পরের বংশধরেরা উপভোগ করিবে। ইহার এই অর্থ নয় যে আমরা নির্জ্জনে একাকী কার্য্য করিয়া যাইব, ঈপ্সিত লক্ষ্যের চিহ্নও দেখিতে পাইব না; এমন হইতে পারে যে আমরা আমাদের জীবিত কালেই সেই লক্ষ্যে পোঁছিতেও পারি, হয়ত ইহার যে সমস্ত চমকপ্রদ দৃশ্য ভবিষ্যতে যুগযুগ ধরিয়া আনন্দ প্রদান করিবে সে সমস্তের আবিষ্কার না করিতে পারি। যে জয়গৌরব আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, তাহা অভিনন্দিত করিবার জন্য হয়ত অনেকেই জীবিত থাকিবেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পরিশ্রমের ও পুরস্কার আছে; কারণ ভবিষ্যৎ জয়ের কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট দেখা দিবে, সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এই জ্ঞানে তাঁহাদের আত্মা সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিবে এবং একবার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে কোনও অত্যাচার যে উহা ধ্বংশ করিতে পারিবে না, আমাদের দেশের ভাগ্য যে গঠিত হইয়া যাইবে, এবং তাহার চিরস্থায়িত্বে আর কোনও সন্দেহই থাকিবে না—এই ধারণায় তাঁহাদের অসীম আত্মতৃপ্তি লাভ হইবে। এই

স্বাধীনতার অগ্রগামী সৈনিকদিগের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা উঠিলে তিনি ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া লয়েন, তাহাতে তিনি অজেয় হইয়া উঠেন এবং পরিশেষে তিনিই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচিত হয়েন। তিনি অতীতকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়েন এবং সেই অতীতের কঠিন আবরণের মধ্য দিয়া তিনি বর্ত্তমানের সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতা অনুসারে কার্য্যের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করেন এবং তাহাতেই তিনি সফলতা লাভ করেন; কারণ পরিণামে তিনি কার্য্যের প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারেন, তখন তাহার কার্য্য পরিণতি লাভ করিয়া শতগুণ ফলপ্রদ হয়। ইহা একদিনে না হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া তাঁহার হস্তকে যখন অসার করিয়া দিবে, তখন তাঁহার গৌরব অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কারণ তিনি মহৎ জীবন যাপন করিয়াছেন, কার্য্য করিবার জন্য সুন্দর ক্ষেত্র রাখিয়া গিয়াছেন, চিরদিন ধরিয়া দেশের সেবা করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ে আত্মবলিদান দিয়াছেন; এবং মরিয়া তিনি মহৎব্যক্তিগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, সেথায় তিনি শাশ্বত অমরত্ব লাভ করিবেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে কাজের লোক আর ঐ যে আত্মম্ভরী ব্যক্তি যে আপনাকে কাজের লোক স্থির করিয়া এই সকল কার্য্যকে মূর্খতার পরিচায়ক মনে করে, এবং সময় বুঝিয়া সুযোগের জন্য চীৎকার করিতে থাকে, সে কি কখন তাহার মতানুযায়ী কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে? না, কারণ এই পৃথিবীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য। তাহার নিজেকে উপযুক্ত বিচার করিতে হইলে সকল যুগের সুযোগ-অন্বেষণকারীদিগের ব্যর্থ চেষ্টার বিষয় সে চিন্তা করুক এবং ইতিহাসের মরুভূমির মাঝে বিক্ষিপ্ত নিষ্ফল কল্পনার কথা সে স্মরণ করুক।

(৪)

তথাপি হয় ত কেহ কঠোর বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাময়িক মোহমুগ্ধ হইয়া বলিবে—"এই দেখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি আর আমাদের পতিত দুর্ব্বল অবস্থা, তোমাদের বৃথা আশা।" তিনি যেন এই স্পষ্ট সত্য মনে রাখেন—জাতি বাঁচিয়া থাকে, সাম্রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। অতীতের সেই বিশাল সাম্রাজ্য সমুহ এখন কোথায়? বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যগুলির মধ্যেও ধ্বংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে সকল জাতি অতীত সাম্রাজ্যের উত্থান ও শাসনশক্তি দেখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা জীবিত রহিয়াছে, যে অত্যাচার

তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে বিভীষিকা আনয়ন করিত, তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাতিসকল এখনও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু সে সাম্রাজ্যগুলি লুপ্ত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান কালের পৃথিবীর জাতি সমূহের বংশধরেরা তখনও বাঁচিয়া থাকিবে, যখন এই প্রভুত্বের জন্য বিবদমান সাম্রাজ্যগুলি ধুলায় মিশিয়া যাইবে যেমন সব অতীত, যেমন সব অন্যায় ধূলিসাৎ হয়। আমরাও ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিব, এবং আমাদের এখনকার এই বিশ্বাসের পরিমাণ আমাদের কার্য্যের পরিমাণ ও ভবিষ্যতে আমাদের মহত্বের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

নারায়ণের নিকষমণি

কর্ম্ম মন্দির—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত উপন্যাস, বৃহৎ পুস্তক সুন্দর বাঁধা, মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান—বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮ নং গুলুওস্তাগরের লেন, দরজিপাড়া, কলিকাতা। এই উপন্যাসখানি একটু নতুন ধরণের; এই যে দেশের নতুন ভাবের ঢেউ এসেছে, তাতে দেশের নরনারীর মনে অশিক্ষিত অলস ভিক্ষাজীবী দরিদ্রদের গড়ে তুলবার যে চেষ্টা চলেছে, এ বইখানি তারি একটা চিত্র। বইখানার ভাষায় ও বর্ণনা ভঙ্গীতে কাঁচা হাতের ছাপ থাকলেও বলতে আমরা বাধ্য গ্রন্থকার উপন্যাসের মধ্যে অনেক নতুন কর্ম্মপন্থার পরিচয় দিয়েছেন, যেগুলি দেশসেবকেরা গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারবেন। নায়ক 'পরেশের' চরিত্রটা বেশ ফুটেছে এবং মেয়ে চরিত্রের মধ্যে "মৃণালিনীর" পরিচয়টা বেশ উপভোগ্য, প্রকৃত শিক্ষিতা মেয়ের চালচলন, ব্যবহার কেমন হয় তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাঠকেরা বইখানি পড়ে তৃপ্তি পাবেন।

ঊনপঞ্চাশী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ১২ নং রামরতন বসুর লেন, শ্যামবাজার থেকে প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা। 'যুগান্তর' সারথি উপেন্দ্রনাথের ঊনপঞ্চাশীর নতুন করে পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যখন এই বইখানায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এক এক করে "বিজলী"তে বের হত, তখন লোকের সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেগুলি পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে বসে থাকত। এমন সরসভঙ্গীতে গুরুগম্ভীর বিষয়গুলির পরিচয় দেওয়া বোধহয়

এক উপেন্দ্রবাবুরই পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে এখানে একটু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষকে তিনি অযথা হুল ফুটিয়েছেন। তা ছাড়া বইখানি চমৎকার উপভোগ্য।

বন্দীর ডায়েরী—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত, ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত মূল্য ১৲ টাকা। অসহযোগ আন্দোলনে ছ'মাস জেলে থেকে হেমন্ত বাবু যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাই এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর সরস লিখন ভঙ্গীতে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

আঁধি লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ২৷৷৹ টাকা। এই উপন্যাস খানিতে সৌরীণ বাবুর পূর্ব্বের যশ অক্ষুণ্ণ ত রয়েছেই আমাদের বোধ হয় এই বইখানিতে বরং সে যশ অনেকটা বেড়েছে। এতে শিশুর মনস্তত্ব বিশ্লেষণের যে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। "নিখিলের" মধ্যে প্রকৃতির যে লীলা তাকে ভিতরের অতি-স্নেহের কারা থেকে বাহিরের মুক্ত বাতাসে বের করতে বারবার চেষ্টা পেয়েছে, "সুষমার" মধ্যে মাতৃ স্নেহের যে রসধারা উচ্ছল হয়ে উঠেছে, "অভয়শঙ্করের" মধ্যে যে অতি স্নেহের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে, এ সবের পরিচয় বাংলা সাহিত্যে অভিনব ও অতুলনীয়। এই বইয়ের শিশু চরিত্রের বিশ্লেষণ পড়বার সময় Marie. Corelli,র The Mighty Atom গ্রন্থখানির অন্তর্গত মুক্তির আনন্দের জন্য ব্যাকুল শিশুর কথা মনে পড়ে। এ বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা অসামঞ্জস্য আমাদের চোখে পড়ে—সেটা হচ্ছে "সুষমার" সন্তান হওয়া ও সেই সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু। অভয়শঙ্করের সঙ্গে সুষমার যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ তাতে সুষমার সন্তান হওয়াটা অস্বাভাবিক এবং অভয়শঙ্করের মনের সংস্কারের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। যা হ'ক এই উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যে অভিনব ও নূতন ধরণের হয়েছে। পাঠকেরা এই বইখানি পড়ে নিশ্চয়ই খুব তৃপ্তি পাবেন।